নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

সমগ্র কিশোর সাহিত্য থেকে

# চার মূর্তির অভিযান

# চার মূর্তির অভিযান

এ ক

## বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘটনা

বললে বিশ্বাস করবে ?

আমরা চার মূর্তি— পটলডাঙার সেই চারজন— টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা আর আমি— স্বয়ং শ্রীপ্যালারাম, চারজনেই এবার স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে ফেলেছি। টেনিদা আর আমি থার্ড ডিভিশন, হাবুল সেকেণ্ড ডিভিশন— আর হতচ্ছাড়া ক্যাবলাটা শুধু যে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে তা-ই নয়, আবার একটা স্টার পেয়ে বসে আছে। শুনছি ক্যাবলা নাকি স্কলারশিপও পাবে। ওর কথা বাদ দাও—ওটা চিরকাল বিশ্বাসঘাতক।

কলেজে ভর্তি হয়ে খুব ডাঁটের মাথায় চলাফেরা করছি আজকাল। কথায় কথায় বলি, আমরা কলেজ স্টুডেন্ট ! আমাদের সঙ্গে চালাকি চলবে না— হুঁ হুঁ !

সেদিন কেবল ছোট বোন আধুলিকে কায়দা করে বলেছি, কী যে ক্লাস নাইনে পড়িস— ছ্যা-ছ্যা ! জানিস লজিক কাকে বলে ?

অমনি আধুলি ফ্যাঁচ করে বললে, যাও যাও ছোড়দা— বেশি ওস্তাদি কোরো না। ভারি তো তিনবারের বার থার্ড ডিভিশনে পাশ করে—

আস্পর্ধা দ্যাখো একবার। যেই আধুলির বিনুনি ধরে একটা টান দিয়েছি, অমনি চ্যাঁ-ভ্যাঁ বলে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একাকার। ঘরে বড়দা দাড়ি কামাচ্ছিল, ক্ষুর হাতে বেরিয়ে এসে বললে, ইস্টুপিড— গাধা ! যেমন ছাগলের মতো লম্বা লম্বা কান, তেমনি বুদ্ধি ! ফের যদি বাঁদরামো করবি— দেব এই ক্ষুর দিয়ে কান দুটো কেটে !

দেখলে ? ইস্টুপিড তো বললেই— সেই সঙ্গে গাধা-ছাগল-বাঁদর তিনটে জন্তুর নাম একসঙ্গে করে দিলে ! আমি যে কলেজে পড়ছি— এখন আমার রীতিমতো একটা প্রেসটিজ হয়েছে— সেটা গ্রাহ্যিই করলে না। আমার ভীষণ রাগ হল। মা বারান্দায় আমসত্ব রোদে দিয়েছিল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে তা থেকে খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে মনের দুঃখ বাইরে চলে এলুম।

আমাদের বাড়ির সামনে একটুখানি পাঁচিল-ঘেরা জায়গা। সেখানে বড়দার সিল্কের পাঞ্জাবি শুকুচ্ছে— নিজের হাতে কেচেছে বড়দা। আর একপাশে বাঁধা রয়েছে ছোড়দির আদরের ছাগল গঙ্গারাম। বেশ দাড়ি হয়েছে গঙ্গারামের। একমনে আমসত্ব খেতে খেতে ভাবছি, এবার সরস্বতী পুজোয় থিয়েটারের সময় গঙ্গারামের দাড়িটা কেটে নিয়ে মোগল সেনাপতি সাজব— এমন সময় দেখি গঙ্গারাম গলার দড়ি খুলে ফেলেছে।

ছাগলের খালি দাড়ি হয় অথচ কান পর্যন্ত গোঁফ হয় না কেন, এই কথাটা খুব দরদ দিয়ে

ভাবছিলুম। ঠিক তক্ষুনি চোখে পড়ল— গঙ্গারাম এগিয়ে এসে বড়দার সিল্কের পাঞ্জাবিতে মুখ দিয়েছে। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলুম। একটু আগেই বড়দা আমাকে গাধা-ছাগল এইসব বলেছে। খেয়ে নিক সিল্কের পাঞ্জাবি— বেশ জব্দ হয়ে যাবে।

দেখলুম, কুর্-কুর্ করে দিব্যি খিয়ে নিচ্ছে গঙ্গারাম। দাড়িটা অল্প অল্প নড়ছে— চোখ বুজে এসেছে আরামে, কান দুটো লটর-পটর করছে। সিল্কের পাঞ্জাবি খেতে রে বেশ ভালোই লাগে দেখা যাচ্ছে। আমসত্ত্ব চিবোনো ভুলে গিয়ে আমি নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ করতে লাগলুম।

ইঞ্চি-দুয়েক খেয়েছে— এমন সময় গেটটা খুলে গেল। গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে হাসপাতালে নাইট ডিউটি সেরে ফিরছে মেজদা। সবে ডাক্তারি পাশ করেছে মেজদা— আর কী মেজাজ! আমাকে দেখলেই ইনজেকশন দিতে চায়।

ঢুকেই মেজদা চেঁচিয়ে উঠল : কী সর্বনাশ! ছাগল যে বড়দার জামাটা খেয়ে ফেললে! এই প্যালা— ইডিয়ট— হতভাগা— বসে বসে মজা দেখছিস নাকি ?

বুঝলুম, গতিক সুবিধের নয়। এবার বড়দা এসে সত্যিই আমার কান কেটে নেবে। কান বাঁচাতে হলে আমারই কেটে পড়া দরকার। ঘাড়-টাড় চুলকে বললুম, লজিক পড়ছিলুম— মানে দেখতে পাইনি— মানে আমি ভেবেছিলুম— বলতে বলতে মেজদার পাশ কাটিয়ে এক লাফে সোজা সদর রাস্তায়।

আমাদের সিটি কলেজ খুব ভাল— খালি ছুটি দেয়। আজও চড়কষষ্ঠী না কোদালে অমাবস্যা— কিসের একটা বন্ধ ছিল। আমি সোজা চলে এলুম চাটুজ্যেদের রোয়াকে। দেখি, টেনিদা হাত-পা নেড়ে কী যেন সব বোঝাচ্ছে ক্যাবলা আর হাবুল সেনকে।

—সামনেই ক্রিসমাস! ব্যস— বাঁই বাঁই করে প্লেনে চেপে চলে যাব! কুট্টিমামা তোদেরও নিয়ে যেতে বলেছে। যাবি তো চল— দিনকতক বেশ খেয়ে-দেয়ে ফিরে আসা যাবে।

ক্যাবলা বললেন, কিন্তু প্লেনের ভাড়া দেবে কে ?

—আরে মোটে কুড়ি টাকা। ড্যাম চিপ।

আমি বললুম, কোথায় যাবে প্লেনে চেপে ? গোবরডাঙা ?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, খেলে কচুপোড়া! এটার মাথাভর্তি কেবল গোবর— তাই জানে গোবরডাঙা আর ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুর! ডুয়ার্সে যাচ্ছি— ডুয়ার্সে। এন্তার হরিণ, দেদার বন-মুরগি, ঘুঘু, হরিয়াল— বলতে বলতেই আমার হাতের দিকে চোখ পড়ল : কী খাচ্ছিস র‍্যা ?

লুকোতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই খপ করে আমসত্ত্বটা কেড়ে নিলে। একেবারে সবটা মুখে পুরে দিয়ে বললে, বেড়ে মিষ্টি তো! আর আছে ?

ব্যাজার হয়ে বললুম, না— আর নেই। কিন্তু ডুয়ার্সের জঙ্গলে যে যেতে চাইছ, শেষে বাঘের খপ্পরে নিয়ে ফেলবে না তো ?

—বাঘ মারতেই তো যাচ্ছি! —আমসত্ত্ব চিবুতে চিবুতে টেনিদা একটু উঁচুদরের হাসি হাসল— যাকে বাংলায় বলে 'হাইক্লাস'!

—অ্যাঁ! —আমি ধপাৎ করে রোয়াকের ওপর বসে পড়লুম : বাঘ না—না—বাঘটাগের মধ্যে আমি নেই!

হাবুল বললে, হ, সত্য কইছস! এদিকে দন্তশূলে মরতে আছি— বাঘের হাতে পইড়্যা পরানডা যাইব গিয়া।

ক্যাবলা বললে, ভালোই তো। দাঁতের ব্যাথার কষ্ট পাচ্ছিস— যদি মারা যাস দেখবি একটুও আর দাঁতের ব্যথা নেই!

টেনিদা আমসত্ত্ব শেষ করে বললে, থাম— ইয়ার্কি করিসনি। আরে ডুয়ার্সের বাঘ-ভাল্লুক

সবাই আমার কুট্টিমামাকে খাতির করে চলে। কুট্টিমামা ভাল্লুকের নাক পুড়িয়ে দিয়েছে— বাঘের বত্রিশটা দাঁত কালীসিঙির মহাভারতের এক ঘায়ে উড়িয়ে দিয়েছে। শেষে সেই বাঘ কুট্টিমামার বাঁধানো দাঁত নিয়ে খেয়ে বাঁচে। সে বাঘটা আজকাল আর মাংস-টাংস খায় না— স্রেফ নিরিমিষি। লোকের বাগান থেকে লাউ-কুমড়ো চুরি করে খায়— সেদিন আবার টুক করে কুট্টিমামার একডিশ আলুর দম খেয়ে গেছে।

ক্যাবলা বললে, গুল!

টেনিদা চোখ পাকিয়ে বললে, কী বললি?

ক্যাবলা বললে, না—মানে, বলছিলুম— গুল বাঘ আর ডোরাদার বাঘ— দু'রকমের বাঘ হয়।

হাবুল বললে, আর-এক রকমের বাঘও হয়। বিছানায় থাকে আর কুটুস কইর‍্যা কামড়ে দেয়। তারে বাগ কয়।

আমিও ভেবে-চিন্তে বললুম, আর তাকে কিছুতেই বাগানো যায় না। কামড়েই সে হাওয়া হয়ে যায়।

টেনিদা রেগে-মেগে বললে, দুত্তোর— খালি বাজে কথা! এদের কাছে কিছু বলতে যাওয়াই ঝকমারি! এই তিনটের নাকে তিনখানা মুগ্ধবোধ বসিয়ে নাকভাঙা বুদ্ধদেব বানিয়ে দিলে তবে ঠিক হয়। ফাজলামি নয়— সোজা জবাব দে— যাবি কি যাবি না? না যাস একাই যাচ্ছি প্লেনে চেপে— তোরা এখানে ভ্যারেণ্ডা ভাজ বসে বসে।

আমি বললুম, বাঘে কামড়াবে না?

—বললুম তো সে আজকাল ভেজিটেবিল খায়। আলুর দম আর মুলো ছেঁচকি খেতে দারুণ ভালবাসে।

ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে, তার আত্মীয়স্বজন?

—তারা কুট্টিমামাকে দেখলেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তখন আর শিকার করবারও দরকার নেই— স্রেফ গলায় দড়ি বেঁধে বাড়িতে নিয়ে এলেই হল।

আমি ভারি খুশি হয়ে বললুম, তা হলে তো যেতেই হয়। আমরা সবাই একটা করে বাঘ সঙ্গে করে বেঁধে আনব।

হাবুল বললে, সেই বাঘে দুধ দিব।

ক্যাবলা বললে, আর সেই বাঘের দুধ বিক্রি করে আমরা বড়লোক হব।

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠে বললে— ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—

আমরা সবাই আরও জোরে চিৎকার করে বললুম—ইয়াক—ইয়াক!

বাবা অফিস যাওয়ার সময় বলে গেলেন, সাতদিনের মধ্যে ফিরে আসবি— একদিনও যেন কলেজ কামাই না হয়।

কোর্টে বেরুতে বেরুতে বড়দা মনে করিয়ে দিলে, দু'-একখানা পড়ার বইও সঙ্গে নিয়ে যাস— খালি ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াসনি।

ছুটির ভিতরে পড়ার বই নিয়ে বসতে বয়ে গেছে আমার! আমি সুটকেসের ভেতর হেমেন রায় আর শিবরামের নতুন বই ভরে নিয়েছি খানকয়েক।

মা এসে বললে, যা-তা খাসনি। তুই যে-রকম পেটরোগা— বুঝে-সুঝে খাবি।

কোত্থেকে আধুলি এসে জুড়ে দিলে, দুটো কাঁচকলা নিয়ে যা ছোড়দা— আর হাঁড়ির ভেতরে গোটাকয়েক শিঙিমাছ।

আমি আধুলির বিনুনিটা চেপে ধরতে যাচ্ছি— সেই সময় মেজদা এসে হাজির। এসেই বলতে লাগল: প্লেনে চেপে যদি কানে ধাপা লাগে তা হলে হাই তুলতে থাকবি। যদি বমি

আসে তা হলে অ্যাভোমিন ট্যাবলেট দিচ্ছি— গোটা-কয়েক খাবি। যদি—

উঃ, উপদেশের চোটে প্রাণ বেরিয়ে গেল ! এর মধ্যে আবার ছোড়দি এসে বলতে আরম্ভ করল ; দার্জিলিঙের কাছাকাছি তো যাচ্ছিস। যদি সস্তায় পাস— কয়েক ছড়া পাথরের মালা কিনে আনিস তো !

—দুত্তোর— বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই বাইরে মোটরের হর্ন বেজে উঠল। আর টেনিদার হাঁক শোনা গেল ; কি রে প্যালা— রেডি ?

—রেডি। আসছি—

তক্ষুনি সুটকেস নিয়ে লাফিয়ে উঠলুম। হাবুলদের মোটরে চেপে ওরা সবাই এসে পড়েছে। মোটরে করে সোজা দমদমে গিয়ে আমরা প্লেনে উঠব। তারপর দু'ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব ডুয়ার্সের জঙ্গলে। তখন আর পায় কে ! কুট্টিমামার ওখানে মজাসে খাওয়া-দাওয়া— চা বাগান আর বনের মধ্যে বেড়ানো— দু'-একদিন শিকারে বেরিয়ে গলায় দড়ি বেঁধে বাঘ-টাঘ নিয়ে আসা। ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস !

সকলকে চটপট প্রণাম-ট্রনাম সেরে নিয়ে গেট খুলে বেরুতে যাচ্ছি, হঠাৎ—

পেছনে বিটকেল 'ব-ব-ব' আওয়াজ আর শার্টের কোনা ধরে এক হ্যাঁচকা টান। চমকে লাফিয়ে উঠলুম। তাকিয়ে দেখি, হতচ্ছাড়া গঙ্গারাম ! দাড়ি নেড়ে নেড়ে আমার জামাটা খাওয়ার চেষ্টা করছে !

—তবে রে অযাত্রা ! পেছু টান !

ধাঁই করে একটা চাঁটি বসিয়ে দিলুম গঙ্গারামের গালে। গঙ্গারাম ম্যা-আ-আ করে উঠল। আর আমার হাতে যা লাগল সে আর কী বলব ! গঙ্গারামটার গাল যে এমন ভয়ানক শক্ত, সে-কথা সে জানত !

মোটর থেকে টেনিদা আবার হাঁক ছাড়ল ; কী রে প্যালা, দেরি করছিস কেন ?

—আসছি— বলে এক ছুটে বেরিয়ে আমি গাড়িতে উঠে পড়লুম। তখনও গঙ্গারাম সমানে ডাকছে ; ম্যা-অ্যা-অ্যা—ভ্যা-অ্যা-অ্যা ! ভাবটা এই : খামকা আমায় একটা রামচাঁটি লাগালে ? আচ্ছা— যাও ডুয়ার্সের জঙ্গলে। এর ফল যদি হাতে-হাতে না পাও— তা হলে আমি ছাগলই নই !

হায় রে, তখন কি আর জানতুম— গঙ্গারামের ভাগনে যা দশগণ্ডা করে মারে, তারই পাল্লায় পড়ে আমার অদৃষ্টে অশেষ দুঃখ আছে এরপর !

গাড়ি দমদম এয়ারপোর্টের দিকে ছুটল।

## দুই

## বিমানে চৈনিক রহস্য

ভজহরি মুখার্জি— স্বর্ণেন্দু সেন— কুশল মিত্র— কমলেশ ব্যানার্জি—

নামগুলো শুনে চমকে চমকে উঠছ তো ? ভাবছ— এ আবার কারা ? হুঁ-হুঁ— ভাববার কথাই বটে। এ হল আমাদের চারমূর্তির ভালো নাম— আগে স্কুলের খাতায় ছিল। এখন কলেজের খাতায়। ভজহরি হচ্ছে আমাদের দুর্দান্ত টেনিদা, স্বর্ণেন্দু হল ঢাকাই হাবুল, কুশল হচ্ছে হতচ্ছাড়া ক্যাবলা আর কমলেশ ? আন্দাজ করে নাও।

এ-সব নাম কি ছাই আমাদের মনে থাকে ? প্লেনে উঠতে যেতেই একটা লোক কাগজ

নিয়ে এইসব নাম ডাকতে লাগল। আমরাও— এই যে— এই যে বলে টকাটক উঠে পড়লুম। হাব্লা তো অভ্যাসে বলেই ফেলল, প্রেজেন্ট স্যার।'

আরে রামো— এ কী প্লেন!

এর আগে আমি কখনও প্লেনে চাপিনি— কিন্তু বড়দা ও মেজদার কাছে কত গল্পই যে শুনেছি। চমৎকার সব সোফার মতো চেয়ার— থেকে-থেকে চা-কফি-লজেন্স-স্যাণ্ড-উইচ-সন্দেশ খেতে দিচ্ছে, উঠে বসলেই সে কী খাতির! কিন্তু এ কী। প্লেনের বারো আনা বোঝাই কেবল বস্তা আর কাপড়ের গাঁট, কাঠের বাক্স, আবার এক জায়গায় দড়ি দিয়ে বাঁধা কয়েকটা হুঁকোও রয়েছে।

শুধু দু'দিকে চারটে সিট কোনওমতে রাখা আছে আমাদের জন্যে। তাতে গদিটদি কিছু ছিল, কিন্তু এখন সব ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার।

হাবুল সেন বললে, অ টেনিদা! মালগাড়িতে চাপাইলা নাকি?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, যা—যা—মেলা বকিসনি! কুড়ি টাকা দিয়ে প্লেন চাপবি— কত আরাম পেতে চাস— শুনি? তবু তো ভাগ্যি যে প্লেনের চাকার সঙ্গে তোদের বেঁধে দেয়নি!

বলতে বলতে জন-তিনেক কোট-প্যাণ্ট-পরা লোক তড়াক করে প্লেনে উঠে পড়ল। তারপর সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো অদ্ভুত কায়দায় টকাটক করে সেই বাক্স-বস্তার স্তূপ পেরিয়ে—একজন আবার হুঁকোগুলোতে একটা হোঁচট খেয়ে ওপাশের 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা একটা কাচের দরজার ওপারে চলে গেল।

টেনিদা বললে, ওরা পাইলট! এখুনি ছাড়বে!

ক্যাবলা বললে, ইস, পাইলট হওয়া কী কষ্ট! বাক্স আর বস্তার উপর দিয়ে লাফাতে হয় কেবল।

যাত্রী আমরা মাত্র চারজন। দু'দিকের সিটগুলোতে চেপে বসতে-না-বসতে হঠাৎ ঘুরুর ঘুরুর করে আওয়াজ আরম্ভ হল। তারপরেই গুড়গুড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল প্লেনটা।

আমরা তাহলে সত্যিই এবার আকাশে উড়ছি!—কী মজা! এবার মেঘের উপর দিয়ে—নদী গিরি কান্তার— মানে আরও কী সব যেন বলে—অটবী-টটবী পার হয়ে দূর-দূরান্তে চলে যাব। আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা এখন থাকলে নিশ্চয় কবিতা লিখত:

পাখি হয়ে যাই গগনে উড়িয়া,
ফড়িং টড়িং খাই ধরিয়া—

কিন্তু ফড়িং খাওয়ার কথা কি লিখত? আমার একটু খটকা লাগল। কবিরা কি ফড়িং খায়? বলা যায় না— যারা কবি হয় তাদের অসাধ্য আর অখাদ্য কিছুই নেই।

এইসব দারুণ চিন্তা করছি, আর প্লেনটা সমানে গুড়-গুড় করে চলেছে। আমি ভাবছিলুম এতক্ষণে বুঝি মেঘের উপর দিয়ে কান্তার মরু দুস্তর পারাবার এইসব পাড়ি দিচ্ছি! দ্যুৎ—কোথায় কী! খালি ডাঙা দিয়ে চলছে তো চলছেই!

টেনিদার পাশ থেকে হাবুল বললে, কই টেনিদা— উড়তে আছে না তো?

ক্যাবলা একটা এলাচ বের করে চিবুচ্ছিল। আমি খপ করে নিতে গেলুম— পেলুম খোসাটা। রাগ করে বললুম, উড়বে না ছাই! মালগাড়ি কোনওদিন ওড়ে নাকি?

ক্যাবলা বললে যাচ্ছে তো গড়গড়িয়ে। কাল হোক, পরশু হোক,—ঠিক পৌঁছে যাবে।

হাবুল করুণ গলায় বললে, কয় কী— অ টেনিদা! এইটা উড়ব না? সঙ্গে সঙ্গে প্লেন দাঁড়িয়ে পড়ল। আর বেজায় জোরে ঘরর্ ঘরর্ করে আওয়াজ হতে লাগল।

আমি বললুম, যাঃ, থেমে গেল!

ক্যাবলা মাথা নেড়ে বললে, হুঁ—স্টেশনে থামল বোধহয়। ইঞ্জিনে জল-টল নেবে।

টেনিদা ভীষণ রেগে গেল এবার।

—টেক কেয়ার ক্যাবলা— আমার কুট্টিমামার দেশের প্লেন! খবরদার—অপমান করবিনি বলে দিচ্ছি!

—তবে ওড়ে না কেন! খালি আওয়াজ করে— মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে!

বলতে বলতেই আবার ঘর্ ঘর্ করে ছুটতে আরম্ভ করল প্লেন। তারপরেই— ব্যাস, টুক্ করে যেন ছোট্ট একটু লাফ দিলে, আর সব আমাদের পায়ের তলায় নেমে যাচ্ছে।

আমরা উড়েছি! সত্যিই উড়েছি।

টেনিদা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে, তবে যে বলছিলি উড়বে না? কেমন— দেখলি তো এখন? ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—

আমরা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললুম, ইয়াক—ইয়াক!

প্লেন উড়েছে। দেখতে দেখতে বাড়িঘরগুলো খেলনার মতো ছোট্ট-ছোট্ট হয়ে গেল, গাছগুলোকে দেখাতে লাগল ঝোপের মতো, রাস্তাগুলো চুলের সিঁথির মতো সরু হয়ে গেল আর রুপোর সাপের মতো আঁকাবাঁকা নদীগুলো আমাদের অনেক নীচে লুকিয়ে রইল।

মেজদার কাছে আগেই শুনেছিলুম, প্লেনে চেপে সিনারি দেখতে হলে জানলার পাশে যেতে হয়। আমিও কায়দা করে আগেই বসে পড়েছি। ক্যাবলা মিনতি করে বললে, তুই আমার জায়গায় আয় না প্যালা— আমিও ভাল করে একটুখানি দেখে নিই!

আমি বললুম, এখন কেন? এলাচের খোসা দেবার সময় মনে ছিল না?

—তোকে চকলেট দেব।

—দে!

ঘাড় চুলকে ক্যাবলা বললে, এখন তো সঙ্গে নেই, কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেব।

—তবে কলকাতায় ফিরেই সিনারি দেখিস।—আমি তক্ষুনি জবাব দিলুম।

ক্যাবলা ব্যাজার হয়ে বললে, না দিলি দেখতে—বয়ে গেল! কীই বা আছে দেখবার। ভারি তো বাঁশবন আর পচা ডোবা—ও তো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে তালগাছের উপরে চাপলেই দেখা যায়।

—দ্রাক্ষাফল অতিশয় টক— শেয়াল বলেছিল।— আমি ক্যাবলাকে উপদেশ দিলুম; তবে যা— তালগাছের মাথাতেই চাপ গে।

ওদিকে টেনিদা আর হাবুলের মধ্যে দারুণ তর্ক চলছে।

হাবুল বললে, আমার মনে হয়, আমরা বিশ হাজার ফুট উপর দিয়া যাইত্যাছি।

টেনিদা নাকটাকে কুঁচকে বললে, ফুঃ। আমার কুট্টিমামার দেশের প্লেন অত তলা দিয়ে যায় না। আমরা কম-সে-কম পঞ্চাশ হাজার ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছি।

ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল। তারপর বললে, কেইসা বাত বোল্‌তা তুমলোক। এ-সব ডাকোটা প্লেন, যেগুলো মাল টানে, কখনও ছ-সাত হাজার ফুটের উপর দিয়ে যায় না।

—এই ক্যাবলাটার সব সময় পণ্ডিতি করা চাই। টেনিদা মুখখানা হালুয়ার মতো করে বললে, থাম, ওস্তাদি করিসনি। এ-সব কুট্টিমামার দেশের প্লেন— পঞ্চাশ-ষাট হাজারের নীচে কথাই কয় না।

ক্যাবলা বললে, আমি জানি।

টেনিদার হালুয়ার মতো মুখটা এবার আলু-চচ্চড়ির মতো হয়ে গেল: তুই জানিস? তবে আমিও জানি। এক্ষুনি তোর নাকে এমন একটা মুগ্ধবোধ বসিয়ে দেব যে—

ক্যাবলা তাড়াতাড়ি বললে, না-না, আমারই ভুল হয়ে গিয়েছিল। এই প্লেনটা বোধহয়

এখন একলাখ ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছে।

—এক লাখ ফুট! —আমি হাঁ করে রইলুম। সেই ফাঁকে ক্যাবলা আমার মুখের ভেতরে আবার একটা এলাচের খোসা ফেলে দিলে।

হাবুল বললে, খাইছে! এক লাখ ফুট! অ টেনিদা—!

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, কী বলবি বল না! একেবারে শিবনেত্তর হয়ে বসে রইলি কেন?

—আমরা তো অনেক উপরে উইঠ্যা পড়ছি!

টেনিদা ভেংচে বললে, তা পড়ছি। তাতে হয়েছে কী?

—চাঁদের কাছাকাছি আসি নাই?

টেনিদা উঁচুদরের হাসি হাসল।

—হ্যাঁ, তা আর-একটু উঠলেই চাঁদে যাওয়া যেতে পারে।

—তা হইলে একটু কও না পাইলটেরে। চাঁদের থিক্যা একটু ঘুইর‍্যাই যাই। বেশ ব্যাড়ানোও হইব, রাশিয়ান স্পুটনিক আইস্যা পড়ছে কি না সেই খবরটাও নিতে পারুম।

ক্যাবলা বললে, হুঁ, চাঁদে সুধাও আছে শুনেছি। এক-এক ভাঁড় করে খেয়ে যাওয়া যাবে।

আমার শুনে কেমন খটকা লাগল। এত সহজেই কি চাঁদে যাওয়া যায়? কাগজে কী সব যেন পড়েছিলুম। চাঁদ, কী বলে— সেই যেন কত লক্ষ মাইল দূরে— মানে, যেতে-টেতে অনেক দেরি হয় বলেই শুনেছিলুম। এমন চট করে কি সেখানে যাওয়া যাবে? আরও বিশেষ করে এই মালগাড়িতে চেপে?

কিন্তু টেনিদাকে সে-কথা বলতে আমার ভরসা হল না। কুট্টিমামার দেশের প্লেন। সে-প্লেন সব পারে। আর পারুক বা না-ই পারুক, মিথ্যে টেনিদাকে চটিয়ে আমার লাভ কী? এসে হয়তো টকাটক চাঁদির উপরে গোটা-কয়েক গাঁট্টাই মেরে দেবে। আমি দুনিয়ার সব খেতে ভালবাসি— কলা, মুলো, পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল, চপ-কাটলেট-কালিয়া— কিচ্ছুতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওই চাঁটি-গাঁট্টাগুলো খেতে আমার ভালো লাগে না—একদম না।

হাবুল আবার মিনতি করে বললে, অ টেনিদা, একবার পাইলটেরে রিকোয়েস্ট কইর‍্যা— চল না চাঁদের থিক্যা একটুখানি ব্যাড়াইয়া আসি।

হাবুল সেন ইয়ার্কি করছে— নির্ঘাত। আমার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ পিট-পিট করলে। কিন্তু টেনিদা কিছু বুঝতে পারল না। বুঝলে হাবলার কপালে দুঃখ ছিল।

টেনিদা আবার উঁচুদরের হাসি হাসল— যাকে বাংলায় বলে, 'হাইক্লাস'। তারপর বললে, আচ্ছা, নেক্‌স্ট্‌ টাইম। এখন একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে কিনা— মানে কুট্টিমামা আমাদের জন্যে এতক্ষণ হরিণের মাংসের ঝোল রেডি করে ফেলেছে। তা ছাড়া রাশিয়ান আর আমেরিকানরা যাওয়ার এত চেষ্টা করছে, ওদের মনে ব্যথা দিয়ে আগে চাঁদে যাওয়াটা উচিত হবে না। ভারি কষ্ট পাবে। আমার মনটা বড় কোমল রে— কাউকে দুঃখ দিতে ইচ্ছে করে না।

আমরা সবাই বললুম, সে তো বটেই!

টেনিদা বললে, যাক— চাঁদে পরে গেলেই হবে এখন। ও আর কী— গেলেই হয়! কিন্তু কথা হচ্ছে, কুট্টিমামার হরিণের ঝোল মনে পড়তে ভারি খিদে পেয়ে গেল রে। কী খাওয়া যায় বল দিকি?

—এই তো খেয়ে এলে— আমি বললুম, এক্ষুনি খিদে পেল?

টেনিদা বললে, পেল। যাই বল বাপু, আমার খিদে একটু বেশি। বামুনের পেট তো—

প্রত্যেক দশ মিনিটেই একেবারে ব্রহ্মতেজে দাউ-দাউ করে ওঠে। কিন্তু কী খাই বল তো ?

হাবুল বললে, ওই তো একটা বস্তা ফুটা হইয়া কী জ্যান পড়তে আছে! লবণ মনে হইত্যাছে। খাইবা ?

আমরা একসঙ্গে তাকিয়ে দেখলুম। তাই বটে। একটা ছোট বস্তায় ছোট একটা ফুটো হয়েছে। সেখান থেকে শাদা গুঁড়ো-গুঁড়ো কী সব পড়ছে। লবণ ? কিন্তু— কিন্তু কেমন সন্দেহজনক।

একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ল টেনিদা। বললে, দেখি কী রকম লবণ।

বলেই বস্তা থেকে খানিকটা আঙুলের ডগায় তুলে নিলে। তারপর চেঁচিয়ে বললে, ডি-ল্যা-গ্র্যাণ্ডি ! ইউরেকা !

আমরা বললুম, মানে ?

—বস্তার রহস্যভেদ। মানে বস্তার চৈনিক রহস্য।

—চৈনিক রহস্য ! সে আবার কী ?— আমি জানতে চাইলুম।

টেনিদা বললে, চিনি—চিনি—পিয়োর চিনি ! যে-চিনি দিয়ে সন্দেশ তৈরি হয়, যে-চিনির রহস্যভরা রসের ভিতরে রসগোল্লা সাঁতার কাটে ! যে-চিনি—

আর বলতে হল না। চিনিকে আমরা সবাই চিনি— কে না চেনে ?

পড়ে রইল চাঁদ, নদী-গিরি-কান্তারের শোভা। আমরা সবাই চিনির বস্তার ফুটোটাকে বাড়িয়ে ফেললুম।

তারপর—

তারপর বলাই বাহুল্য।

## তিন

## অতঃপর কুট্টিমামা

প্লেন এসে মাটিতে নামল।

ভালোই হল। চৈনিক রহস্য ভেদ করে এখন গলা একেবারে আঠা-আঠা হয়ে আছে—জিভটা যেন কাঁচাগোল্লা হয়ে আছে। জিভে কাঁচাগোল্লা চেপে বসলে ভালোই লাগে— কিন্তু জিভটাই কাঁচাগোল্লা হয়ে গেলে কেমন বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি মনে হতে থাকে। এর মধ্যে আবার থেকে-থেকে কেমন গা গুলিয়ে উঠছিল। শেষকালে ক্যাবলার গায়েই খানিকটা বমি করে ফেলব কি না ভাবতে ভাবতেই দেখি, প্লেনটা সোজা থেমে গেল, আর বাইরে থেকে কারা টেনে দরজাটা খুলে দিলে !

দেখি, দুজন কুলি একটা ছোট লোহার সিঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। নীচে পাঁচ-সাত জন লোক দাঁড়িয়ে।

চিনির বস্তার রাহাজানি ধরা পড়বার আগেই সরে পড়া দরকার। টুপ-টুপ করে নেমে পড়লুম আমরা।

বা—রে—কোথায় এলুম ? সামনে একটা টিনের ঘর, একটুখানি মাঠ— তার ভেতরে প্লেনখানা এসে নেমেছে। মাঠের তিন দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ঘন জঙ্গল— আর একদিকে মেঘের মতো মাথা তুলে আছে নীল পাহাড়। হাওয়ায় বড়-বড় ঘাস দুলছে আশেপাশে।

হাবুল বললে, তাইলে আইস্যা পড়লাম !

কিন্তু কুট্টিমামা ? কোথায় কুট্টিমামা ! যে-ক'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে— তার মধ্যে তো কুট্টিমামা নেই ? সেই লম্বা তালগাছের মতো চেহারা, মিশমিশে কালো রং—মাথায় খেজুরপাতার মতো ঝাঁকড়া চুল— মানে টেনিদা আমাদের কাছে যে-রকম বর্ণনা দিয়েছে আগে— সে-রকম কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না ?

বললুম, ও টেনিদা, কুট্টিমামা কোথায় ?

টেনিদা বললে, ঘাবড়াসনি— ওই তো আসছে মামা !

চালাঘরটার পাশে একখানা জিপ গাড়ি এসে থেমেছে এক্ষুনি ! তা থেকে নেমেছে বেঁটে-খাটো গোলগাল একটি ভালোমানুষ লোক। গায়ে নীল শার্ট, পরনে পেন্টুলুন। টেনিদা দেখিয়ে বললে, ওই তো কুট্টিমামা।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলুম, ওই কুট্টিমামা ! হতেই পারে না ! ঝাঁকড়া চুল— তালগাছের মতো লম্বা— কালিগোলা রং— সে কী করে অমন ছোটখাটো টাক-মাথা গোলগাল মানুষ হয়ে যাবে ! আর গায়ের রংও তো বেশ ফর্সা।

ক্যাবলা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই টেনিদা এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে একটা প্রণাম ঠুকে দিলে।

—মামা, আমরা সবাই এসে গেছি।

কী আর করা। কুট্টিমামার রহস্য পরে ভেদ করে যাবে— আপাতত আমরাও একটা করে প্রণাম করলুম।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে হেসে বললেন, বেশ— বেশ, ভারি আনন্দ হল তোমাদের দেখে। তা পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো ?

ফস করে বলে ফেললুম, না মামা— বেশি কষ্ট হয়নি। মানে, চিনির বস্তাটা ছিল—

টেনিদার চোখের দিকে তাকিয়েই সামলে গেছি সঙ্গে সঙ্গে। মামা বললেন, চিনির বস্তা ! সে আবার কী ?

টেনিদা বললে, না মামা, ওসব কিছু না। চিনির বস্তা-টস্তা আমরা চিনি না। মানে, প্যালা খুব চিনি খেতে ভালোবাসে কিনা— তাই সারা রাস্তা স্বপ্ন দেখছিল।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, তাই নাকি ?

—হ্যাঁ মামা। —টেনিদা উৎসাহ পেয়ে বলতে আরম্ভ করলে, আমারও ওরকম হয়। তবে আমি আবার চপ-কাটলেটের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। এই হাবুল সেন খালি রাবড়ি আর চমচমের স্বপ্ন দেখে। আর এই ক্যাবলা— মানে এই বাচ্চা ছেলেটা পরীক্ষায় স্কলারশিপ পায় আর চুয়িং গামের স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে।

ক্যাবলা ভীষণভাবে প্রতিবাদ করে উঠল, কক্ষনো না ! চুয়িং গামের স্বপ্ন দেখতে আমি মোটেই ভালোবাসি না। আমিও চপ-কাটলেট রাবড়ি চমচম— এইসবের স্বপ্ন দেখি।

কুট্টিমামা আবার অল্প একটু হেসে বললেন, দেখা যাক, স্বপ্নকে সফল করা যায় কি না। এখন চলো। মালপত্র প্লেনে কিছু নেই তো ? সব হাতে ? ঠিক আছে।

—তোমাদের বাগান কতদূরে মামা ?

—এই মাইল-ছয়েক। দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই চলে যাব। এসো—

একটু পরেই আমরা জিপে উঠে পড়লুম। ড্রাইভারের পাশে বসে মামা বললেন, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে দেওয়ান বাহাদুর। অনেক দূরে থেকে আসছে এরা— এদের খিদে পেয়েছে।

টেনিদা বললে, তা যা বলেছ মামা ! সকালে বলতে গেলে কিছুই খাইনি— পেট চুঁই-চুঁই করছে।

টেনিদা কিছু খায়নি ! বাড়ি থেকে গলা পর্যন্ত ঠেসে বেরিয়েছে— প্লেনে এসে কমসে কম একসের চিনি মেরে দিয়েছে। টেনিদা যদি কিছু না খেয়ে থাকে, আমি তো তিনদিন উপোস করে আছি !

জিপ ছুটল।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কালো পিচের পথ পড়ে আছে মস্ত একটা ফিতের মতো। আমাদের জিপ চলেছে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ছায়া ছড়িয়ে আছে পথের উপর— কেমন মিষ্টি গলায় নানারকমের পাখি ডাকছে।

টেনিদা বসেছে আমাদের পাশেই। ফাঁক পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি যে-রকম বলেছিলে, তোমার কুট্টিমামার চেহারা তো একদম সে-রকম নয় ! গুল দিয়েছিলে বুঝি ?

টেনিদা বললে, চুপ-চুপ। কুট্টিমামা শুনলে এখুনি একটা ভীষণ কাণ্ড হয়ে যাবে।

—ভীষণ কাণ্ড ! কেন ?

টেনিদা আমার কানে-কানে বললে, সে এক লোমহর্ষক ব্যাপার— বুঝলি ! বললে পেত্যয় যাবি না— নেপালী বাবার একটা ছু-মন্তরেই কুট্টিমামার চেহারা বিলকুল পালটে গেছে।

—ছু-মন্তর ! সে আবার কী ?

—পরে বলব, এখন ক্যাঁচম্যাচ করিসনি। কুট্টিমামা শুনলে দারুণ রাগ করবে। বলতে বারণ আছে কিনা !

আমি চুপ করে গেলুম। একটা যা-তা গল্প বানিয়ে দেবে এর পরে। কিন্তু টেনিদার কথায় আর বিশ্বাস করি আমি ? আমি কি পাগল না পেণ্টুলুন ?

এর মধ্যে হাবুল সেন কুট্টিমমার পাশে বসে বকবকানি জুড়ে দিয়েছে : আইচ্ছা মামা, এই জঙ্গলটার নাম কী ?

মামা বললেন, এর নাম দইপুর ফরেস্ট।

—এই জঙ্গলে বুঝি খুব দই পাওয়া যায় ?

মামা বললে, দই তো জানি না—তবে বাঘ পাওয়া যায় বিস্তর।

এতক্ষণ পরে ক্যাবলা বললে, সেই বাঘের দুধেই দই হয়।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, তা হতে পারে। কখনও খেয়ে দেখিনি।

শুনে দু'চোখ কপালে তুলল হাবুল সেন : আরে মশয়, কন কী ? আপনে বাঘের দই খান নাই ? আপনার অসাধ্য কর্ম আছে নাকি ? কালীসিঙ্গির মহাভারতের একখানা ঘাও দিয়া— বলেই হঠাৎ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল হাবুল ; গেছি— গেছি— খাইছে।

কুট্টিমামা অবাক হয়ে বললেন, কী হল তোমার ? কিসে খেলে তোমাকে ?

কিসে খেয়েছে সে আমি দেখেছি। টেনিদা কটাং করে একটা রাম-চিমটি বসিয়েছে হাবুলের পিঠে।

—আমারে একখানা জব্বর চিমটি দিল।

কুট্টিমামা পেছন ফিরে তাকালেন ; কে চিমটি দিয়েছে ?

টেনিদা চটপট বললে, না মামা, কেউ চিমটি দেয়নি। এই হাবুলটার— মানে পিঠে বাত আছে কিনা, তাই যখন-তখন কড়াং করে চাগিয়ে ওঠে, আর অমনি ওর মনে হয় কেউ ওকে চিমটি কেটেছে।

হাবুল প্রতিবাদ করে বললে, কখনও না— কখনও না ! আমার কোনও বাত নাই !

টেনিদা রেগে গিয়ে বললে, চুপ কর্ হাবলা, মুখে মুখে তক্কো করিসনি। বাত আছে মামা— ও জানে না। ওর পিঠে বাত আছে— কানে বাত আছে, নাকে বাত আছে—

কুট্টিমামা বললেন, কী সাঙ্ঘাতিক। এইটুকু বয়সেই এ-সব ব্যারাম !

—তাই তো বলছি মামা— টেনিদার মুখখানা করুণ হয়ে এল : এইজন্যেই তো ওকে নিয়ে আমাদের এত ভাবনা ! কতবার ওকে বলেছি— হাবলা, অত বাতাবিনেবু খাসনি— খাসনি । বাতাবি খেলেই বাত হয় । এ তো জানা কথা । কিন্তু ভালো কথা কি ওর কানে যায় ? তার ওপর বাতাসা দেখলে তো কথাই নেই— তক্ষুনি খেতে শুরু করে দেবে । এতেও যদি বাত না হয়—

হাবুল আবার হাউমাউ করে কী সব বলতে যাচ্ছিল, কুট্টিমামা তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, বাতাবিলেবু আর বাতাসা খেলে বাত হয় ? তা তো কখনও শুনিনি !

—হচ্ছে মামা, আজকাল আকছার হচ্ছে। কলকাতায় আজকাল কী যে সব বিচ্ছিরি কাণ্ডকারখানা ঘটছে সে আর তোমায় কী বলব ! এমনকি একটু বেশি করে জল খেয়েছ তো সঙ্গে-সঙ্গেই জলাতঙ্ক ।

শুনে কুট্টিমামা চোখ কপালে তুলে বসে রইলেন খানিকক্ষণ । বললেন, কী সর্বনাশ !

কথা বলে কিছু লাভ হবে না বুঝে হাবুল একদম চুপ । আমি গ্যাঁট হয়ে বসে টেনিদার চালিয়াতি শুনছি । কিন্তু ক্যাবলাটা আর থাকতে পারল না, ফস করে বলে ফেলল, গুল !

টেনিদা চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী বললি ?

ক্যাবলা দারুণ হুঁশিয়ার—সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়েছে। নইলে জিপ থেকে নেমেই নির্ঘাত টেনিদা ওকে পটাপট কয়েকটা চাঁটি বসিয়ে দিত চাঁদির ওপর । বললে, না-না, চারদিকে কী সুন্দর ফুল ফুটেছে !

আমি অবশ্যি কোথাও কোনও ফুল-টুল দেখতে পেলুম না। কিন্তু ক্যাবলা বেশ ম্যানেজ করে নিয়েছে ।

কুট্টিমামা খুশি হয়ে বললেন, 'হুঁ, ফুল এদিকে খুব ফোটে । কাল জঙ্গলে যখন বেড়াতে নিয়ে যাব, তখন দেখবে ফুলের বাহার !

হাবুলটা এক নম্বরের বোকা, এর মধ্যেই আবার বলে ফেলেছে, মামা আপনার পোষা বাঘটা—

মামা ভীষণ চমকে গেলেন ।

—কী বললে ! পোষা বাঘ ! সে আবার কী ?

কিন্তু টেনিদা তক্ষুনি উল্টে দিয়েছে কথাটা । হাঁ-হাঁ করে বললে, না-না মামা, বাঘ-টাঘ নয়। হাবুলের নাকেও বাত হয়েছে কিনা, তাই কথাগুলো ওইরকম শোনায় । ও বলছিল তোমার ধোসা রাগ্‌টা— মানে সেই ধুসো কম্বলটা— যেটা তুমি দার্জিলিঙে কিনেছিলে সেটা আছে তো ?

হাবুল একবার হাঁ করেই মুখ বন্ধ করে ফেললে । কুট্টিমামা আবার দারুণ অবাক হয়ে বললেন, তা সে কম্বলটার কথা এরা জানলে কী করে ?

—হেঁ—হেঁ—টেনিদা খুব কায়দা করে বললে, তোমার সব গল্পই আমি এদের কাছে করি কিনা ! এরা যে তোমাকে কী ভক্তি করে মামা, সে আর তোমায়—

কথাটা শেষ হল না । ঠিক তখুনি—

জিপের বাঁ দিকের জঙ্গলটা নড়ে উঠল । আর জিপের সামনে দিয়ে এক লাফে যে রাস্তার ওপারে গিয়ে পড়ল, তাকে দেখামাত্র চিনতে ভুল হয় না । তার হলদে রঙের মস্ত শরীরটার উপর কালো কালো ডোরা— ঠিক যেন রোদের আলোয় একটা সোনালি তীর ছুটে গেল সামনে দিয়ে ।

আমি বললুম, বা—বা—বা—

'ঘ'-টা বেরুবার আগেই টেনিদা জাপটে ধরেছে ক্যাবলাকে— আবার ক্যাবলা পড়েছে

আমার ঘাড়ের ওপর। আর হাবুল আর্তনাদ করে উঠেছে : খাইছে—খাইছে!

চার

## বনের বিভীষিকা

বনের বাঘ অবিশ্যি বনেই গেল, 'হালুম' করে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ল না। আর কুট্টিমামা হা হা করে হেসে উঠলেন।

—ওইটুকুখানি বাঘ দেখেই ভিরমি খেলে, তোমরা যাবে জঙ্গলে শিকার করতে!

ততক্ষণে গাড়ি এক মাইল রাস্তা পার হয়ে এসেছে। জঙ্গল ফাঁকা হয়ে আসছে দু'ধারে। আমরাও নড়েচড়ে বসেছি ঠিক হয়ে।

টেনিদা বললে, না মামা, আমরা ভয় পাইনি। বাঘ দেখে ভারি ফুর্তি হয়েছিল কিনা, তাই বাঃ-বাঃ বাঘ বলে আনন্দে চেঁচামেচি করছিলুম। শুধু প্যালাই যা ভয় পেয়েছিল। ও একটু ভিতু কিনা।

বাঃ—ভারি মজা তো! সবাই মিলে ভয় পেয়ে শেষে আমার ঘাড়ে চাপানো! আমি তাড়াতাড়ি বললুম, না-না, আমিও ভয় পাইনি। এই ক্যাবলাটাই একটুতে নার্ভাস হয়ে যায়, তাই ওকে ভরসা দিচ্ছিলুম!

ক্যাবলা নাক-মুখ কুঁচকে বললে, ব্যাস্—খামোশ!

শুনে আমার ভারি রাগ হয়ে গেল।

—খা মোষ! কেন—আমি মোষ খেতে যাব কী জন্যে? তোর ইচ্ছে হয় তুই মোষ খা—গণ্ডার খা—হাতি খা। পারিস তো হিপোপটেমাস ধরে ধরে খা!

কুট্টিমামা মিটমিট করে হাসলেন।

—ও তোমাকে মোষ খেতে বলেনি—বলেছে 'খামোশ'—মানে,'থামো'। ওটা হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা।

বললুম, না ওসব আমার ভালো লাগে না। চারদিকে বাঘ-টাঘ রয়েছে—এখন খামখা রাষ্ট্রভাষা বলবার দরকার কী?

হাবুল সেন বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল।

—বুঝছস নি প্যালা—বাঘেও রাষ্ট্রভাষা কয়: হাম—হাম! মানেডা কী? আমি—আমি—যে-সে পাত্তর না—সাইক্ষাৎ বাঘ। বিড়ালে ইন্দুররে ডাইক্যা কয়: মিঞা আও—আইসো ইন্দুর মিঞা, তোমারে ধইর‍্যা চাবাইয়া খামু। আর কুত্তায় কয়: ভাগ—ভাগ—ভাগ হো—পলা—পলা, নইলে ঘ্যাঁক্কৎ কইর‍্যা তর ঠ্যাঙে একখানা জব্বর কামড় দিমু—হুঃ!

টেনিদা বললে, বাপ্‌রে, কী ভাষা! যেন বন্দুক ছুঁড়ছে!

হাবুল বুক চিতিয়ে বললে, বীর হইলেই বীরের মতো ভাষা কয়। বোঝলা।

জবাব দিলে কুট্টিমামা। বললেন, বোঝলাম। কে কেমন বীর, দু'-একদিনের মধ্যেই পরীক্ষা হবে এখন। এ-সব আলোচনা এখন থাক। এই যে—এসে পড়েছি আমরা।

সত্যি, কী গ্র্যান্ড জায়গা!

তিনদিকে জঙ্গল—আর একদিকে চায়ের বাগান ঢেউ খেলে পাহাড়ের কোলে উঠে গেছে। তার উপরে কমলালেবুর বাগান—অসংখ্য নেবু ধরেছে, এখনও পাকেনি,

হলদে-হলদে রঙের ছোপ লেগেছে কেবল। চা-বাগানের পাশে ফ্যাক্টরি, তার পাশে সায়েবদের বাংলো। আর একদিকে বাঙালি কর্মচারীদের সব কোয়ার্টার্স—কুট্টিমামার ছোট্ট সুন্দর বাড়িটি। অনেকটা দূরে কুলি লাইন। ভেঁপু বাজলেই দলে দলে কুলি মেয়ে ঝুড়ি নিয়ে চায়ের পাতা তুলতে আসে, কেউ-কেউ পিঠে আবার ছোট্ট বাচ্চাদেরও বেঁধে আনে—বেশ মজা লাগে দেখতে।

সায়েবরা কলকাতায় বেড়াতে গেছে—কুট্টিমামাই বাগানের ছোট ম্যানেজার। আমরা গিয়ে পৌঁছুবার পর কুট্টিমামাই বললেন, খেয়ে-দেয়ে একটু জিরিয়ে নাও, তারপর বাগান-টাগান দেখব'খন।

টেনিদা বললে, সেই কথাই ভালো মামা। খাওয়া-দাওয়াটা আগে দরকার। সে-টিনি যে কখন—বলতে বলতেই সামলে নিলে : মানে সেই যে কখন থেকে পেট চিন-চিন করছে।

মামা হেসে বললেন, চান করে নাও—সব রেডি।

চান করবার তর আর সয় না—আমরা সব হুটোপুটি করে টেবিলে গিয়ে বসলুম।

একটা চাকর নিয়ে কুট্টিমামা এ-বাড়িতে থাকেন, কিন্তু বেশ পরিপাটি ব্যবস্থা চারদিকে। সব সাজানো গোছানো ফিটফাট। চাকরটার নাম ছোট্টুলাল। আমরা বসতে-না-বসতে গরম ভাতের থালা নিয়ে এল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, টেনিদা, তুমি যে রামভরসার কথা বলছিলে, সে কোথায়?

টেনিদা আমার কানে-কানে বললে, চুপ—চুপ। রামভরসার নাম করিসনি। সে ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে।

—কী ভীষণ কাণ্ড?

—ভাত দিয়েছে—খা না বাপু। টেনিদা দাঁত খিঁচুনি দিলে : অত কথা বলিস কেন? বকবক করতে করতে একদিন তুই ঠিক বক হয়ে উড়ে যাবি, দেখে নিস।

—বকবক করলে বুঝি বক হয়?

—হয় বইকি। যারা হাঁস-ফাঁস করে তারা হাঁস হয়, যারা ফিস-ফিস করে তারা 'ফিশ'—মানে মাছ হয়—

আরও কী সব বাজে কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল। ফিশকে থামিয়ে দিয়ে 'ডিশ' এসে পড়েছে। মানে, মাংসের ডিশ।

—ইউরেকা!—বলেই টেনিদা মাংসের ডিশে হাত ডোবাল। একটা হাড় তুলে নিয়ে তক্ষুনি এক রাম-কামড়। ছোট্টুলাল ওর গ্লাসে জল দিতে যাচ্ছিল, একটু হলে তার হাতটাই কামড়ে দিত।

ক্যাবলা বললে, মামা—হরিণের মাংস বুঝি? মামা বললেন, শিকারে না গেলে কি হরিণ পাওয়া যায়? আজকে পাঁঠাই খাও, দেখি কাল যদি একটা মারতে-টারতে পারি।

—আমরা সঙ্গে যাব তো?

—আমার আপত্তি নেই।—কুট্টিমামা হাসলেন : কিন্তু বাঘের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়—

ক্যাবলা বললে, না মামা, আমরা ভয় পাব না। পটলডাঙার ছেলেরা কখনও ভয় পায় না। আমাদের লিডার টেনিদাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না।...আচ্ছা টেনিদা, আমরা কি বাঘকে ভয় করি?

টেনিদা চোখ বুজে, গলা বাঁকিয়ে একমনে একটা হাড় চিবুচ্ছিল। হঠাৎ কেমন ভেবড়ে গেল।

বিচ্ছিরি রেগে, নাকটাকে আলুসেদ্ধর মতো করে বললে, দেখছিস মন দিয়ে একটা কাজ করছি, খামকা কেন ডিসটার্ব করছিস র‍্যা? হাড়টাকে বেশ ম্যানেজ করে এনেছিলুম, দিলি

মাটি করে।

হাবুল ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে উঠল : তার মানে ভয় পাইতাছে!

—হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছে। তোকে বলেছে।

—কওনের কাম কী, মুখ দেইখ্যাই তো বোঝন যায়। অখনে পাঠার হাড় খাইতাছ, ভাবতাছ বাঘে তোমারে পাইলেও ছাইড়্যা কথা কইব না—তখন তোমারে নি ধইর‍্যা—

বাঁ হাত দিয়ে দুম করে একটা কিল টেনিদা বসিয়ে দিলে হাবুলের পিঠে।

হাবুল হাউমাউ করে বললে, মামা দ্যাখেন—আমারে মারল!

মামা বললেন, ছিঃ ছিঃ মারামারি কেন! ওর যদি ভয় হয়, তবে ও বাড়িতে থাকবে। যাদের সাহস আছে, তাদেরই সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

টেনিদার মেজাজ গরম হয়ে গেল।

—কী, আমি ভিতু!

ক্যাবলা বললে, না—না, কে বলেছে সে-কথা! তবে কিনা তোমার সাহস নেই—এই আর কি!

—সাহস নেই!—এক কামড়ে পাঁঠার হাড় গুঁড়িয়ে ফেলল টেনিদা : আছে কি না দেখবি কাল। বাঘ-ভালুক-হাত্তি-গণ্ডার যে সামনে আসবে, এক ঘুষিতে তাকে ফ্ল্যাট করে দেব!

ক্যাবলা বললে, এই তো বাহাদুরকা বাত—আমাদের লিডারের মতো কথা!

মামা বললেন, শুনে খুশি হলাম। তবে যা ভাবছ তা নয়, বাঘ অমন ঝট করে গায়ের উপর এসে পড়ে না। তাকেই খোঁজবার জন্যে বরং অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তা ছাড়া সঙ্গে দুটো বন্দুকও থাকবে—ঘাবড়াবার কিছু নেই।

হাবুল সেন খুশি হয়ে বললে, হ, সেই কথাই ভালো। বাঘেরে ঘুষিঘাষি মাইর‍্যা লাভ নাই—বাঘে তো আর বক্সিং-এর নিয়ম জানে না! দিব ঘচাং কইর‍্যা একখানা কামড়! বন্দুক লইয়া যাওনই ভালো।

টেনিদা বললে, আঃ, তোদের জ্বালায় ভালো করে একটু খাওয়া-দাওয়া করবারও জো নেই, খালি বাজে কথা! কই হে ছোট্টুলাল, আর-এক প্লেট মাংস আনো। বেড়ে রেঁধেছে বাপু, একটু বেশি করেই আনো।

বিকেলে আমরা চায়ের বাগানে বেশ মজা করেই বেড়ালুম, কারখানাও দেখা হল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলুম দূরের কমলানেবুর বন পর্যন্ত। জায়গাটা ভালো—সামনে একটা ছোট্ট নদী রয়েছে। আমাদের সঙ্গে ছোট্টুলাল গিয়েছিল, সে বললে, নদীটার নাম জংলি।

সবাই বেশ খুশি, কেবল আমার মেজাজটাই বিগড়ে ছিল একটু। মানে, ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। চা জিনিসটা খেতে ভালো, আমি ভেবেছিলুম চায়ের পাতা খেতেও বেশ খাসা লাগবে। বাগান থেকে একমুঠো কাঁচা পাতা ছিঁড়ে চুপি-চুপি মুখেও দিয়েছিলুম। মাগো—কী যাচ্ছেতাই খেতে! আর সেই থেকে মুখে এমন একটা বদখত স্বাদ লেগে ছিল যে নিজেকে কেমন ছাগল-ছাগল মনে হচ্ছিল—যেন একটু আগেই কতগুলো কচি ঘাস চিবিয়ে এসেছি।

তার মধ্যে আবার নদীর ধারে দাঁড়িয়ে টেনিদা বাজখাঁই গলায় গান ধরলে :

এমনি চাঁদিনি রাতে সাধ হয় উড়ে যাই,—
কিন্তু ভাই বড় দুঃখ আমার যে পাখা নাই—

বলতে যাচ্ছি—এই বিকেলে চাঁদের আলো এল কোত্থেকে, এমন সময় ফস করে ক্যাবলা

সুর ধরে দিলে :

তোমার যে ল্যাজ আছে,
তাই দিয়ে ওড়ো ভাই—

টেনিদা ঘুষি পাকিয়ে বললে, তবে রে—

ক্যাবলা টেনে দৌড় লাগাল। টেনিদা তাড়া করল তাকে। আর পরমুহূর্তেই এক গগনভেদী আর্তনাদ।

হাবুল, ছোট্টুলাল আর আমি দেখতে পেলুম। স্বচক্ষেই দেখলুম।

ঘন ঝোপের মধ্য একখানা কদাকার লোমশ হাত বেড়িয়ে এসে খপ করে টেনিদার কাঁধ চেপে ধরল। আর তারপর বেরিয়ে এল আরও কদাকার, আরও ভয়ঙ্কর একখানা মুখ। সে-মুখ মানুষের নয়। ঘন লোমে সে-মুখও ঢাকা—দুটো হিংস্র হলদে চোখ তার জ্বলজ্বল করছে—আর কী নিষ্ঠুর নির্মম হাসি ঝকঝক করছে তার দু'-সারি ধারালো দাঁতে!

হাবুল বললে, অরণ্যের বি—বি—বি—

আর বলতে পারল না। আমি বললুম—ভীষিকা, তারপরেই ধপাস করে মাটিতে চোখ বুজে বসে পড়লুম। আর টেনিদার করুণ মর্মান্তিক আর্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠল।

## পাঁচ

## শাখামৃগ-কথা

অরণ্যের সেই করাল বিভীষিকার সামনে যখন হাবুল স্তম্ভিত, আমি প্রায় মূর্ছিত, ক্যাবলা খানিক দূরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আর টেনিদার গগনভেদী আর্তনাদ—তখন—

তখন আশ্চর্য সাহস ছোট্টুলালের। মাটি থেকে একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে সে ছুটল সেই ভীষণ জন্তুটার দিকে : ভাগ্—ভাগ্ জলদি।

টেনিদা তো গেছেই—বোধহয় ছোট্টুলালও গেল। আমি দু'-চোখের পাতা আরও জোরে চেপে ধরেছি, এমনি সময় কিচ-কিচ কিচিং-কাচুং বলেই একটা অদ্ভুত আওয়াজ, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবলার অট্টহাসি!

চমকে তাকিয়ে দেখি, বনের সেই বিভীষিকা টেনিদার ঘাড় ছেড়ে দিয়ে লাফে লাফে সামনের একটা উঁচু শিমুল ডালে উঠে যাচ্ছে। আর ছোট্টুলাল শুকনো ডালটা উঁচিয়ে তাকে ডেকে বলছে : আও—আও—ভাগ্‌তা কেঁও! মার্‌কে মার্‌কে তেরি হাড্ডি হাম পটক দেব—হুঁঃ!

কিন্তু হাড্ডি পটকাবার জন্যে সে আর গাছ থেকে নামবে বলে মনে হল না। বরং গাছের উপর থেকে তার দলের আরও পাঁচ-সাতজন দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কিঁচ-কিঁচ-কাঁচালঙ্কা—কিঞ্চিৎ—

এখনও কি ব্যাপারটা বলে দিতে হবে? ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা আর কিছু নয়, একটা গোদা বানর।

ক্যাবলা তখনও হাসছে। বললে, টেনিদা—ছ্যা-ছ্যা। পটলডাঙার ছেলে হয়ে একটা বানরের ভয়ে তুমি ভিরমি গেলে।

টেনিদা মুখ ভেংচে বললে, থাম—থাম—বেশি চালিয়াতি করতে হবে না। কী করে বুঝব যে ওটা বানর? খামকা জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে বিচ্ছিরি মুখ করে অমন করে ঘাড়টা

খিমচে দিলে কার ভালো লাগে বল দিকি ?

আমি বেশ কায়দা করে বললুম, আমি আর হাবলা তো দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম যে ওটা বানর। তাই আমরা হাসছিলুম।

হাবুল বললে, হ-হ। আমরা খুবই হাসতে আছিলাম।

ছোট্টুলালই গোলমাল করে দিলে। বললে, কাঁহা হাঁসতে ছিলেন ? আপলোগ'তো ডর খাকে একদম ভুঁইপর বৈঠে গেলেন।

টেনিদা বললে, মরুক-গে, আর ভালো লাগছে না। মেজাজ-টেজাজ সব খিঁচড়ে গেছে। দিব্যি বিকেল বেলায় গান-টান গাইছিলুম, কোত্থেকে বিটকেল একটা গোদা বানর এসে দিলে মাটি করে।

ছোট্টুলাল বললে, আপ অত চিল্লালেন কেন ? বান্দরকে কষিয়ে এক থাপ্পড় লাগিয়ে দিতেন—উসকো বদন বিগড়াইয়ে যেত—হুঁঃ।

—তার আগে ও আমারই বদন বিগড়ে দিত! বাপরে কী দাঁত! নে বাপু, এখন বাড়ি চল। বাঁদরের পাল্লায় পড়ে পেটের খিদে বড্ড চাগিয়ে উঠেছে—কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক।

শিমুল গাছের উপর বানরগুলো তখনও কিচির-মিচির করছিল। ছোট্টুলাল শুকনো ডালটা তাদের দেখিয়ে বললে, আও—একদফা উতার আও! এইসা মারেগা কি—

উত্তরে পটাপট করে কয়েকটা শুকনো শিমুলের ফল ছুটে এল। আমি আঁই আঁই আঁই করে মাথাটা সরিয়ে না নিলে একটা ঠিক আমার নাকে এসে লাগত।

হাবুল সেন বললে, শূন্য থিক্যা গোলাবর্ষণ করতাছে—পাইর‍্যা উঠবা না। অখনি ধরাশায়ী কইর‍্যা দিব সক্কলরে।

বলতে বলতে—ঠকাস! ঠিক তাক-মাফিক একটা শিমুলের ফল এসে লেগেছে ছোট্টুলালের মাথায়। এ দাঃদ্দা—বলেসে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল—আর তক্ষুনি ফলটা ফেটে চৌচির হয়ে শিমুল তুলো উড়তে লাগল চারিদিকে।

ছোট্টুলালের সব বীরত্ব উবে গেছে তখন।—বহুৎ বদমাস বান্দর—বলেই সে প্রাণপণে ছুট লাগাল। বলা বাহুল্য, আমরাও কি আর দাঁড়াই ? পাঁচজনে মিলে অ্যায়সা স্পিডে ছুটলাম যে অলিম্পিক রেকর্ড কোথায় লাগে তার কাছে। গাছের উপর থেকে বানরদের জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল—পলাতক শত্রুদের ওরা যেন বলছে—দুয়ো, দুয়ো!

কুট্টিমামার কোয়ার্টারে ফিরে মন-মেজাজ যাচ্ছেতাই হয়ে গেল।

পটলডাঙার চারমূর্তি আমরা—কোনও কিছু আমাদের দমাতে পারে না—শেষকালে কিনা একদল বানর আমাদের বিধ্বস্ত করে দিলে! ছ্যা-ছ্যা!

প্লেট-ভর্তি হালুয়ায় একটা খাবলা বসিয়ে টেনিদা বললে, কী রকম খামকা বাঁদরগুলো আমাদের ইনসাল্ট করলে বল দিকি!

ক্যাবলা বললে, অসহ্য অপমান!

আমি বললুম, এর প্রতিকার করতে হবে!

হাবুল বললে, হ, অবশ্যই প্রতিশোধ লইতে হইব।

টেনিদা বললে, যা বলেছিস—নির্মম প্রতিশোধ নেওয়া দরকার!—বলেই আমার হালুয়ার প্লেট ধরে এক টান।

আমি হাঁ-হাঁ করে উঠলুম, তা আমার প্লেট ধরে টানাটানি কেন ? আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও নাকি ?

—মেলা বকিসনি। টেনিদা থাবা দিয়ে আমার প্লেটের অর্ধেক হালুয়া তুলে নিলে : তোর

ভালোর জন্যেই নিচ্ছি। অত খেয়ে তুই হজম করতে পারবি না—যা পেটরোগা !

—আর তুমি পেটমোটা হয়েই বা কী কীর্তিটা করলে শুনি ?—আমার রাগ হয়ে গেল—একটা বানরের ভয়ে একদম মূর্ছা যাচ্ছিলে !

—কী বললি ?—বলে টেনিদা আমাকে একটা চাঁটি মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্যাবলা হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে এমন চেঁচিয়ে উঠল যে থমকে গেল টেনিদা।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, সর্বনাশ হয়ে গেল !

—কিসের সর্বনাশ রে ?

—বানরটা তোমার ঘাড়ে আঁচড়ে দেয়নি তো ?

—দিয়েছে বোধহয় একটু।—টেনিদা ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে বললে, সে কিছু না—সামান্য একটুখানি নখের আঁচড়। তা কী হয়েছে ?

ক্যাবলা মুখটাকে প্যাঁচার মতন করে বললে, দিয়েছে তো একটু আঁচড় ! বাস—আর দেখতে হবে না।

টেনিদার গলায় হালুয়ার তাল আটকে গেল।

—কী দেখতে হবে না ? অমন করছিস কেন?

ক্যাবলা মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলে, কুকুরে কামড়ালে কী হয় ?

হাবুল দারুণ উৎসাহে বললে, কী আবার হইব ? জলাতঙ্ক।

টেনিদার মুখখানা কুঁকড়ে-টুকড়ে কি রকম যেন হয়ে গেল। ঠিক একতাল হালুয়ার মতো হয়ে গেল বলা চলে।

—কিন্তু আমাকে তো কুকুরে কামড়ায়নি। আর, মাত্র একটু আঁচড়ে দিয়েছে—তাতে—

এইবার আমি কায়দা পেয়ে বললুম, যা হবার ওতেই হবে—দেখে নিয়ো।

—কী হবে ? টেনিদার হালুয়ার মতো মুখটা এবার ডিমের ডালনার মতো হয়ে গেল।

ক্যাবলা খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে, কেন, প্রেমেন মিত্তিরের গল্প পড়োনি ? হবে স্থলাতঙ্ক।

—অ্যাঁ !

—তারপর তুমি আর মাটিতে থাকতে পারবে না। বানরের মতো কিচমিচ আওয়াজ করবে—

আমি বললুম, এক লাফে গাছে উঠে পড়বে—

হাবুল সেন বললে, আর গাছের ডালে বইস্যা বইস্যা কচি-কচি পাতা ছিড়্যা ছিড়্যা খাইবা।

টেনিদা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল : আর বলিসনি—সত্যি আর বলিসনি ! আমি বেজায় নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি ! ঠিক কেঁদে ফেলব বলে দিলুম !

বোধহয় কেঁদেও ফেলত—হঠাৎ কুট্টিমামা এসে গেলেন।

—কী হয়েছে রে ? এত গণ্ডগোল কেন ?

—মামা, আমার স্থলাতঙ্ক হবে—টেনিদা আর্তনাদ করে উঠল।

—স্থল্যাতঙ্ক ! তার মানে ?—কুট্টিমামার চোখ কপালে চড়ে গেল।

আমরা সমস্বরে ব্যাপারটা যে কী তা বোঝাতে আরম্ভ করলুম। শুনে কুট্টিমামা হেসেই অস্থির। বললেন, ভয় নেই, কিছু হবে না। একটু আইডিন লাগিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শুনে টেনিদার সে কী হাসি ! বত্রিশটা দাঁতই বেরিয়ে গেল যেন।

—তা কি আর আমি জানি না মামা ! এই প্যালারামকেই একটু ঘাবড়ে দিচ্ছিলুম কেবল।

চালিয়াতিটা দেখলে একবার ?

ছয়

## বড় বেড়ালের আবির্ভাব

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেলে আমরা বারান্দায় এসে বসলুম। আকাশ আলো করে চাঁদ উঠেছে। চায়ের বাগান, দূরের শালবন, আরও দূরের পাহাড় যেন দুধে স্নান করছে। ঝিরঝিরে মিষ্টি হওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। খাওয়াটাও হয়েছে দারুণ। আমার ইচ্ছে করছিল গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ি। কিন্তু কুট্টিমামা গল্পের থলি খুলে বসেছেন—সে-লোভও সামলানো শক্ত।

আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসেছি। একখানা ছোট তক্তোপোশে আধশোয়া হয়ে আছেন কুট্টিমামা। সামনে গড়গড়া রয়েছে, গুড়গুড় করে টানছেন আর গল্প বলছেন।

সেই অনেক কাল আগের কথা। জঙ্গল, কেটে সবে চায়ের বাগান হয়েছে। বড় বড় পাইথন, বাঘ আর ভালুকের রাজত্ব। কালাজ্বর, আমাশা, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া এ-সব লেগেই আছে। বাগানে কুলি রাখা শক্ত—দু'দিন পরে কে কোথায় পালিয়ে যায় তার আর ঠিক-ঠিকানা থাকে না। কুলিদের আর কী দোষ—প্রাণের মায়া তো সকলেরই আছে।

তখন কুট্টিমামার বাবা এই বাগানে কাজ করতেন। পাকা রাস্তা ছিল না—ষোলো মাইল দূরের রেল স্টেশন থেকে গোরুর গাড়ি করে আসতে হত। বাঘ-ভালুকের সঙ্গে দেখা হত হামেশা। কুট্টিমামা তখন খুব ছোট্ট—কত জন্তু-জানোয়ার দেখেছেন কতবার।

তারই একদিনের গল্প।

সেবার কুট্টিমামা আর ওঁর বাবা নেমেছেন রেল থেকে—বিকেলের গাড়িতে। সময়টা শীতকাল। একটু পরেই অন্ধকার নেমে এল। কাঁচা রাস্তা দিয়ে গোরুর গাড়ি দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে ঘন অন্ধকার শাল-শিমুলের বন। কুট্টিমামা চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, জঙ্গলের মধ্যে থোকা থোকা জোনাক জ্বলছে। অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে হাতির ডাক—হরিণ ডেকে উঠছে মধ্যে মধ্যে—গাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে খরগোশ। ঝিঁঝির আওয়াজ উঠছে একটানা—ঘুমের ভেতর গাছের ডালে কুঁক-কুঁক করছে বনমুরগি।

দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন কুট্টিমামা। টুকুটুক করে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

গাড়ি থেমে দাঁড়িয়েছে। শালবনের ভেতর দিয়ে সেদিনও অনেকখানি চাঁদের আলো পড়েছে বনের রাস্তায়। সেই চাঁদের আলোয় আর বনের ছায়ায়—

কুট্টিমামা যা দেখলেন তাতে তাঁর দাঁত-কপাটি লেগে গেল।

গোরুর গাড়ি থেকে মাত্র হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে এক বিকট মূর্তি। কুচকুচে কালো লোমে তার শরীর ভরা—বুকে কলারের মতো একটা শাদা দাগ। হিংসায় তার চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে। মুখটা খোলা—দু'সারি দাঁত যেন সারি সারি ছুরির ফলার মতো সাজানো। আলিঙ্গন করবার ভঙ্গিতে হাত দু'খানা দু'পাশে বাড়িয়ে অল্প টলতে টলতে এগিয়ে আসছে সে।

ভালুক!

ভালুক বলে কথা নয়। এদিকের জঙ্গলে ছোটখাটো ভালুক কিছু আছেই। কিন্তু মানুষ দেখলে তারা প্রায়ই বিশেষ কিছু বলে না—মানে মানে নিজেরাই সরে যায়। কিন্তু এ তো তা নয়! অদ্ভুত বড়—অস্বাভাবিক রকমের বিরাট! আর কী তার চোখ—কী দৃষ্টি সেই চোখে!

সাক্ষাৎ নরখাদক দানবের চেহারা !

গোরু দুটোর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। ছটফট করছে—একটা বিচিত্র আওয়াজ বেরুচ্ছে তাদের গলা দিয়ে।

কুট্টিমামার বাবাও দারুণ ভয় পেয়েছেন। সঙ্গে বন্দুক নেই। ফিসফিস করে বললেন, এখন কী হবে ?

নেপালী গাড়োয়ান বীর বাহাদুর একটু চুপ করে থেকে বললে, কিছু ভাববেন না বাবু, আমি ব্যবস্থা করছি।

ফস করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল বীর বাহাদুর। ভালুক তখন পাঁচ-সাত হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। কুট্টিমামা ভাবলেন, এইবার গেছে বীর বাহাদুর ! ভালুক এখুনি দু'হাতে ওকে বুকে জাপটে ধরবে। আর যা চেহারা ভালুকের ! একটি চাপে সমস্ত হাড়-পাঁজরা একেবারে গুঁড়ো করে দেবে। ভালুকরা অমনি করেই মানুষ মারে কিনা !

কিন্তু নেপালীর বাচ্চা বীর বাহাদুর—এ-সব জিনিসের অন্ধিসন্ধি সে জানে। চট করে গাড়ির তলা থেকে একরাশ খড় বের করে আনল, তারপর দেশলাই ধরিয়ে দিতেই খড়গুলো মশালের মতো দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল।

আর সেই জ্বলন্ত খড়ের আঁটি নিয়ে সে এগিয়ে গেল ভালুকের দিকে।

আগুন দেখে ভালুক থমকে গেল। তারপর বীর বাহাদুর আর-এক পা সামনে বাড়াতেই সব বীরত্ব কোথায় উবে গেল তার ! অতবড় পেল্লায় জানোয়ার চার পায়ে একেবারে চোঁ-চোঁ দৌড়—বোধহয় সোজা পাহাড়ে পৌঁছে তবে থামল।

কুট্টিমামার গল্প শুনে আমরা ভীষণ খুশি।

টেনিদা বললে, মামা, আমাদের কিন্তু শিকারে নিয়ে যেতে হবে।

কুট্টিমামা বললেন, যে-সব বীরপুরুষ, বাঘের ডাক শুনলেই—

হাবুল সেন বললে, না মামা, ভয় পামু না। আমরাও বাঘেরে ডাকতে থাকুম। ডাইক্যা কমু—আইসো বাঘচন্দর, তোমার লগে দুইটা গল্পসল্প করি।

ক্যাবলা বললে, আর বাঘও অমনি হাবুলের পাশে বসে গলা জড়িয়ে ধরে গল্প আরম্ভ করে দেবে।

তখন আমি বললুম, আর মধ্যে-মধ্যে হাবলাকে আলুকাবলি আর কাজুবাদাম খেতে দেবে।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কী যে বাজে বকবক করিস তোরা—একদম ভালো লাগে না। হচ্ছে একটা দরকারি কথা—খামকা ফাজলামি জুড়ে দিয়েছে !

কুট্টিমামা হাই তুলে বললেন, আচ্ছা, সে হবে-এখন। এখন যাও—শুয়ে পড় গে সবাই। কালকে ভাবা যাবে এ-সব।

টেনিদা, হাবুল আর কুট্টিমামা শুয়েছেন বড় ঘরে। এ-পাশের ছোট ঘরটায় আমি আর ক্যাবলা।

বিছানায় শুয়েই কুর-কুর্ করে ক্যাবলার নাক ডাকছে। কিন্তু অচেনা জায়গায় এত সহজেই আমার ঘুম আসে না। মাথার কাছে টিপয়ের উপর একটা ছোট্ট নীল টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। আমি ল্যাম্পটাকে একেবারে বালিশের পাশে টেনে আনলুম। তারপর সুটকেস খুলে শিবরামের নতুন হাসির বই 'জুতো নিয়ে জুতোজুতি' আরাম করে পড়তে লেগে গেলুম।

পড়ছি আর নিজের মনে হাসছি। পাশেই খোলা জানালা দিয়ে মিঠে হাওয়া আসছে।

দুধের মতো জ্যোৎস্নায় স্নান করছে চায়ের বাগান আর পাহাড়ের বন। কতক্ষণ সময় কেটেছে জানি না। হাসতে হাসতে এক সময় মনে হল, জানালার গায়ে যেন খড়খড় করে আওয়াজ হচ্ছে।

তাকিয়ে দেখি, একটা বেশ বড়সড় বেড়াল। জানালার ওপর উঠে বসেছে—আর জ্বলজ্বল করে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

বললুম, যাঃ—যাঃ—পালা—

পালাল না। বললে, গর্—র্—র্—

তখন আমার ভালো করে চোখে পড়ল।

শুধু একটা নয়—তার পাশে আর একটা বেড়াল। সেটার হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড মাথা—ভাঁটার মতো চোখ আর গায়ে ঘন হলদের ওপর কালো ফোঁটা।

এত বড় বেড়াল! আর, এ কেমন বেড়াল!

সেই প্রকাণ্ড বেড়ালটাও বললে, গর্—র্—র্—ঘুঁ!

আর ঘুঁ! আমি তৎক্ষণাৎ আকাশ-ফাটানো চিৎকার করলুম একটা। তারপর ক্যাবলাকে জড়িয়ে ধরে সোজা আছড়ে পড়লুম বিছানা থেকে। টেবিল-ল্যাম্পটাও সেইসঙ্গে ভেঙে চুরমার।

আর সেই অথই অন্ধকারের ভেতর—

## সাত

অন্ধকারে দু'জনে কুমড়োর মতো গড়াগড়ি খেলুম কিছুক্ষণ। ক্যাবলা যতই বলে, ছাড়—ছাড়—আমি ততই গোঁ-গোঁ করতে থাকি: বা—বা—বা—

এর ভেতরে লণ্ঠন হাতে টেনিদা, হাবলা আর কুট্টিমামা এসে হাজির। ছোট্টুলালও সেইসঙ্গে।

—কী হল? কী হল?

—আরে ই ক্যা ভৈল বা?

ক্যাবলা তড়াক করে উঠে পড়ে বললে, দেখুন না কুট্টিমামা, ঘুমের ঘোরে প্যালাটা আমাকে জাপটে ধরে খাট থেকে নীচে ফেলে দিলে। কিছুতেই ছাড়ে না। খালি বলছে: বা—বা—বা—

বা—বা—বা?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তার মানে, বাঃ—বেশ মজার খেলা হচ্ছে। এই প্যালাটাকে নিয়ে সব সময় একটা কেলেঙ্কারি হবে। ওর গাধার মতো লম্বা কান দুটোকে ইস্ক্রুপের মতো পেঁচিয়ে দিলে তবে ঠিক হয়। এই প্যালা, এই গাড়লরাম—উঠে পড় বলছি—

আমি কি উঠি নাকি অত সহজে? ক্যাবলার পাশেই তো সেই একজোড়া বড় বেড়াল বসে আছে।

চোখ বুজেই বলি, ওই জা—জা—জা—

হাবুল বললে, কারে যাইতে কস? কেডা যাইব?

বললুম, জা—নালায়!

হাবুল বিচ্ছিরি চটে গেল। বললে, কী, আমি নালায় যামু? ক্যান, আমি নালায় যামু

ক্যান ? তর ইচ্ছা হইলে তুই যা—নালায় যা, নর্দমায় যা—গোবরের গাদায় যা—

আমি তেমনি চোখ বুজে বললুম, দুত্তোর ! জানালায় তা—তাকিয়ে দ্যাখো না একবার ! বা—বাঘ বসে আছে ওখানে !

—অ্যাঁ, জানালায় বাঘ !—বলেই টেনিদা লাফ দিয়ে প্রায় হাবুলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

হাবুল বললে, ইঃ—খাইছে, খাইছে !

কুট্টিমামা হেসে উঠলেন।

—জানালায় বাঘ ? এই বাগানের ভেতর ? ঘুমের ঘোরে তুমি স্বপ্ন দেখেছ প্যালারাম !

ক্যবলা খিক-খিক করে হাসতে লাগল, হাবুল খ্যা-খ্যা করে হাসতে লাগল, টেনিদা খ্যাঁচর-খ্যাঁচর করে হেসে চলল। আর পেট চেপে ধরে খৌ-খৌ করে সবচেয়ে বেশি করে হাসতে লাগল ছোট্টুলাল।

—খৌ —খৌ—খৌ ! আরে খৌ—খৌ—বাঘ কাঁহাসে আসবে ! বাঘের মাসি এসেছিল হোবে—খৌ—খৌ—খৌ— ! কী খুশি সবাই, আর কী হাসির ধুম ! যেন আমাকে পাগল পেয়েছে ওরা !

রাগে গা জ্বলে গেল, আমি উঠে বসলুম।

—চলে গেছে কিনা, তাই সবাই হাসছে। যদি দেখতে—

টেনিদা বললে, আমিও তো দেখেছিলুম। এই একটু আগেই। দুটো গণ্ডার আর তিনটে জলহস্তী আমার দিকে তেড়ে আসছিল। আমি এক ঘুষিতে একটা গণ্ডারকে মেরে ফেললুম—দুই চড়ে দুটো জলহস্তী কাত হয়ে গেল। বাকি দুটো ল্যাজ তুলে পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে পালাল। অবিশ্যি স্বপ্নে।

আবার হাসি। ছোট্টুলাল তো প্রায় নাচতে লাগল। আমার এত রাগ হল যে ইচ্ছে করতে লাগল ছোট্টুলালের ঠ্যাঙে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দিই কিংবা ওর কানের ভেতরে কতগুলো লাল পিঁপড়ে ঢেলে দিই !

কুট্টিমামা বললেন, থামো—থামো। সবটা ওকে বলতে দাও। আচ্ছা প্যালারাম, তুমি তো ঘুমুচ্ছিলে ?

—মোটেই না। আমি শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিলুম।

—তারপরে ?

—জানালায় একটা গর্‌র্‌ আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি—

বলতে বলতে আমি থেমে গেলুম। বুকের ভেতর দুরুদুরু করে উঠল।

—কী দেখলে ?

—প্রথমে একটা বাচ্চা—বড়সড় বেড়ালের মতো দেখতে। তারপরে আর একটা। জালার মতো মাথা—ভাঁটার মতো চোখ, কাঁটার মতো গোঁফ—

ক্যাবলা বললে, ধামার মতো পিলে—

টেনিদা বললে, শিঙিমাছের মতো শিং—

হাবুল জুড়ে দিলে, আর পটোলের মতন দাঁত—

বুঝতে পারছ তো ? আমার সেই পালা-জ্বরের পিলে আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোলকে ঠাট্টা করা হচ্ছে।

শুনে কুট্টিমামা পর্যন্ত মুচকে মুচকে হাসলেন, আর খৌয়া—খৌ-খৌ বলে আবার নাচতে শুরু করে দিলে ছোট্টুলাল।

ভাবছি ছোট্টুলালকে এবার সত্যিই ঘ্যাঁচ করে একখানা ল্যাং মেরে দেব যা থাকে কপালে, এমন সময় টেনিদা বললে, না কুট্টিমামা, প্যালাকে আর এখানে রাখতে ভরসা হচ্ছে না !

ক্যাবলা বললে, ঠিক। বাঘের কথা শুনেই যেমন করছে, তাতে তো—

হাবুল বললে, বাঘ একখান চক্ষের সামনে দেখলে ভয়েই মইর‍্যা যাইব নে।

টেনিদা বললে, কালই ওকে প্লেনে তুলে দেওয়া যাক।

ক্যাবলা বললে, বেয়ারিং পোস্টে।

হাবুল বললে একটা বস্তার মইধ্যে কইর‍্যা তুইল্যা দিলেই হইব—পয়সা লাগব না।

অপমানে আমার কান কটকট করতে লাগল, খালি মনে হতে লাগল নাকের ডগায় কতগুলো উচ্চিংড়ে লাফাচ্ছে। কিন্তু এদের কোনও কথা বলে লাভ নেই—এরা বিশ্বাস করবে না। আমি রেগে গোঁজ হয়ে বসে রইলুম।

কুট্টিমামা বললেন, যাও—যাও, সব শুয়ে পড় এখন। আর রাত জেগে শরীর খারাপ করে লাভ নেই।

আমি শেষবার বলতে চেষ্টা করলুম : আপনারা বিশ্বাস করছেন না—

টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, ঝা—যা খুব হয়েছে! আর ওস্তাদি করতে হবে না তোকে! রাক্ষসের মতো খাবি আর শেষে পেট-গরম হয়ে উষ্টুম-ধুষ্টুম স্বপ্ন দেখবি! দরজা-জানালা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে পড়। কাল ভোরের প্লেনে যদি তোকে কলকাতায় চালান না করি তো—

দাঁত বের করে আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল, ঠিক এমনি সময় একটা বিকট হইহই চিৎকার। সেটা এল কুলি লাইনের দিক থেকে। তারপরেই জোর টিন-পেটানোর আওয়াজ।

আমরা সবাই ভীষণভাবে চমকে উঠলুম। সবচাইতে বেশি করে চমকালেন কুট্টিমামা।

—ও কী! ও আওয়াজ কেন?

চিৎকারটা আরও জোরালো হয়ে উঠল। আকাশ ফেটে যেতে লাগল টিন-পেটানোর শব্দে! তারপরেই কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বাইরে থেকে হাঁক পাড়ল : বাবু—ছোট ম্যানেজারবাবু—

ছোট্টুলাল দরজা খুলে দিলে। দেখা গেল, লণ্ঠন হাতে কুলিদের একজন সর্দার।

কুট্টিমামা বললেন, কী হয়েছে রে? অমন চেঁচামেচি করছিস কেন?

—কুলি-লাইনে বাঘ এসেছিল বাবু।

বাঘ!

ঘরে যেন বাজ পড়ল। আর দেখি—সবাই যেন হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আর ছোট্টুলালের চোখ দুটো একেবারে গোল গোল হয়ে গেছে—টিকিটা খাড়া হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে!

এইবারে জুত পেয়ে আমি বললুম, কেমন বাপু ছোট্টুলাল—আভি খোঁয়া-খোঁয়া করকে হাসছ না কেন?

কুলি-সর্দার বললে, একটা চিতা, সঙ্গে বাচ্চাও ছিল। একটা গোরুকে জখম করেছে আর একটা ছাগল মেরে নিয়ে পালিয়েছে।

কারও মুখে আর কথাটি নেই।

আর—তক্ষুনি আমি ঘর কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করলুম। সেই হাসির আওয়াজে টেনিদা লাফিয়ে হাবুলের ঘাড়ের উপর পড়ল—হাবুল গিয়ে পড়ল ছোট্টুলালের গায়ে, আর—আঁই দাদা বলে চিৎকার ছেড়ে একেবারে চিৎপাত হল ছোট্টুলাল।

আট

কুট্টিমামা বললেন, তাই তো ! আবার চিতাবাঘের উৎপাত শুরু হল ।

সর্দার বললে, ওদিকের জঙ্গলে বাঘ বড় বেড়ে গেছে বাবু। মাসখানেক ধরেই আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। এখন একেবারে বাগানে ঢুকে পড়েছে। আর আসতে যখন শুরু করেছে তখন সহজে ছাড়বে না !

কুট্টিমামা মাথা নেড়ে বললেন, দু'-একটা না মারলে চলছে না। আচ্ছা, এখন যাও। দেখি কাল সকালে কী করা যায়।

সর্দার চলে গেল। কুট্টিমামা বললেন, তোমরাও সব শুয়ে পড় গে। আর প্যালারাম—এবার ভালো করে জানালা বন্ধ করে দিয়ো।

আমরা সব চুপচাপ চলে এলুম। হাবুলের বকবকানি, টেনিদার চালিয়াতি আর ফুট-কাটা একদম বন্ধ। সব একেবারে স্পিক্‌টি নট। আর ছোট্টুলাল ? সে তো তক্ষুনি—আঁই দাদা হো—বলে একটা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

খড়খড়ি আর কাচের জানালা দুটোই বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি, ক্যাবলা বললে, খড়খড়িটা খুলে রাখ না প্যালা ! বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ দেখা যাবে। কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে রে !

আমি দাঁত-মুখ খুব বিচ্ছিরি করে বললুম, থাক—আর প্রাকৃতিক দিরিশ্যি দেখে দরকার নেই ! চাঁদের আলোয় খুশি হয়ে বাঘ এসে যদি জানালার বাইরে দাঁত খিঁচোয় ?

—আমরাও বাঘকে ভেংচে দেব !

—আর যদি জানালা ভেঙে ঢোকে ?

—আমরা দরজা ভেঙে পালিয়ে যাব !

দেখেছ ইয়ার্কিটা একবার ! বাঘ যেন আমাদের পটলডাঙার একাদশী কুণ্ডু—পেছন থেকে 'হাঁড়ি ফাটল' 'হাঁড়ি ফাটল' বলে চেঁচিয়ে চটিয়ে দিলেই হল !

বললুম, বেশি ফেরেব্বাজি করিসনে ক্যাবলা, ঘুমো ! —বলে আমি দুটো জানালাই শক্ত করে এঁটে দিলুম। ঘুমোতে চেষ্টা করছি—কিন্তু ঘুম কি ছাই আসে ? খালি বন্ধ জানালায় চোখ পড়ছে। এই মনে হচ্ছে বাইরের খড়খড়ি কেউ কড়কড় করে আঁচড়াচ্ছে, আবার যেন শুনছি ঘাসের উপর দিয়ে কী সব হাঁটছে—হুমহাম করে কী একটা ডেকেও উঠল। এদিকে আবার নাকের ডগায় দু'-তিনটে মশা বিন-বিন করছে। ক্যাবলাটা তো দেখতে-না-দেখতেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি কী করি ? মশারি একটা আছে—ফেলে দেব ? কিন্তু মশারির ভেতরে আমি একদম শুতে পারি না—কেমন দম আটকে আসে।

তা হলে মশাই মারি—কী আর করা ? কিন্তু চেষ্টা করে দেখলুম, কিছুতেই মারা যায় না। নাকের ওপর চাঁটি হাঁকড়েছি তো কানের কাছে গিয়ে পোঁ করে উঠল। আবার কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণ করেছি তো শত্রুবাহিনী নাসিকে এসে উপস্থিত। কাঁহাতক পেরে ওঠা যায় ? আধঘণ্টা ধরে নিজেকে সমানে চাঁটিয়ে এবং ঘুষিয়ে—শেষতক হাল ছেড়ে দিলুম। বললুম, যাও না বাপু—জঙ্গলে যাও না ! বাঘ আছে—হাতি আছে, অনেক রক্ত আছে তাদের গায়ে। যত খুশি খাও গে ! আমি পটলডাঙার প্যালারাম—সবে পালা-জ্বরের পিলেটা সেরেছে—আমার রক্তে আর কী পাবে ? খানিক পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল বই তো নয় !

যেই বলেছি—অমনি কী কাণ্ড !

হুড়মুড়িয়ে জানালাটা ভেঙে পড়ল। আর কী সর্বনাশ ! বাইরে—বাইরে যে একটা হাতি ! পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড—জমাট অন্ধকার দিয়ে তৈরি তার শরীর ! দুটো কুতকুতে চোখে আমার দিকে খানিক তাকিয়েই কেমন যেন মিটমিট করে হাসল ! তারপরেই করেছে কী—হাত-দশেক লম্বা একটা শুঁড় বাড়িয়ে কপাৎ করে আমার একটা লম্বা কান টেনে ধরেছে !

এতক্ষণ তো আমি পান্তুয়ার মতো পড়ে আছি—কিন্তু এবার আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া ! 'বাপ-রে—মা-রে—মেজদা রে—পটলডাঙা রে'—বলে রাম-চিৎকার ছেড়েছি !

আর তক্ষুনি কানের কাছে ক্যাবলা বললে, কী আরম্ভ করেছিস প্যালা ? ভিতুর ডিম কোথাকার !

বললুম, হা—হা—হাতি !

ক্যাবলা বললে, গোদা পায়ের লাথি !

চমকে চোখ মেলে চাইলুম। কোথায় হাতি—কোথায় কী ! ঘরভর্তি ঝকঝকে সকালের আলো। আর ক্যাবলা কোত্থেকে একটা পাখির পালক কুড়িয়ে এনে আমার কানের ভেতর দিতে চেষ্টা করছে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। আর পালকটা আমার কানে ঢোকাতে না পেরে ভারি ব্যাজার হল ক্যাবলা। বললে, কোথায় রে তোর হা—হা—হাতি ? স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি ?

—বকিসনি ! আমার কানে পালক দিচ্ছিলি কেন ?

—তোকে জাগাবার জন্যে। কিন্তু পারলুম কই ? তার আগেই তো জেগে গেলি—ইস্টুপিড কোথাকার !

—মারব এক থাপ্পড়—বলে আমি রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

সকালের চা এবং সেইসঙ্গে লুচি-আলুভাজা-রসগোল্লার 'টা' বেশ ভালোই হল তারপর কুট্টিমামা চলে গেলেন ফ্যাক্টরিতে। আমাদের বলে গেলেন, তোমরা বাগানের ভেতর ঘুরে বেড়াও—ভয়ের কিছু নেই। তবে জঙ্গলের দিকে যেয়ো না। চিতাবাঘের উৎপাত যখন শুরু হয়েছে, তখন সাবধান থাকাই ভাল।

টেনিদা বললে, হেঃ—বাঘ ! জানো কুট্টিমামা—রাত্তিরেই কেমন একটু বেকায়দা হয়ে যায় ! কিন্তু দিনের বেলায় বাঘ একবার আসুক না সামনে ! এমন একখানা আস্তারকাট্ বসিয়ে দেব—

হাবুল বললে, আপনার কালীসিঙ্গির মহাভারতের থিক্যাও জব্বর !

কুট্টিমামা অবাক হয়ে বললেন, আমার কালীসিঙ্গির মহাভারত। তার মানে ?

হাবুল সবে বলতে যাচ্ছে ; সেই যে মহাভারতের একখানা পেল্লায় ঘাও নি মাইর‍্যা—

আর বলতে পারল না। তার আগেই টেনিদা ওর পিঠে কটাং করে একটা জবরদস্ত চিমটি কেটে দিয়েছে।

হাবুল হাউ-মাউ করে উঠল : খাইসে, খাইসে !

কুট্টিমামা আরও অবাক হয়ে বললেন, খাইছে ! কীসে খেল তোমাকে ?

—টেনিদা !

টেনিদা তাড়াতাড়ি বললে, না মামা, আমি ওকে খাচ্ছি না ! ওটা এত অখাদ্য যে বাঘে খেলেও বমি করে দেবে। ওর পিঠে একটা ডেয়ো পিঁপড়ে কামড়াচ্ছিল, সেটাকে ফেলে দিলুম কেবল। তুমি যাও—নিজের কাজে যাও।

খানিকক্ষণ কেবল বোকা-বোকা হয়ে তাকিয়ে দেখে কুট্টিমামা চলে গেলেন।

টেনিদা এবার হাবুলের মাথায় কুটুস্ করে একটা ছোট্ট গাঁট্টা দিলে। বললে, তোকে ও-সব বলতে আমি বারণ করিনি ? জানিসনে—নিজের বীরত্বের কথা বললে কুট্টিমামা লজ্জা পায় ?

—আর তোমার সব চালিয়াতি ফাঁস হয়ে যায় ! টুক করে কথাটা বলেই ক্যাবলা তিন হাত লাফিয়ে সরে গেল। টেনিদা একটা চাঁটি হাঁকিয়েছিল, সেটা হাওয়ায় ঘুরে এল।

যাই হোক, আমরা চার মূর্তি তো বাগানে বেরিয়ে পড়লুম। চমৎকার সকাল, মিঠে রোদ্দুর, প্রাণ-জুড়োনো হাওয়া। দোয়েল শিস দিচ্ছে, বুলবুলি নেচে বেড়াচ্ছে। মাথার ওপর শিরিষ পাতার ঝিরিঝিরি। ঝুড়ি কাঁধে কুলি মেয়েরা টুকটুক করে পাতি তুলছে—বেশ লাগছে দেখতে।

পাতি তোলা দেখতে দেখতে কখন আমি দলছাড়া হয়ে অন্য দিকে চলে গেছি টেরই পাইনি। যখন খেয়াল হল, দেখি বাগানের বাইরে চলে এসেছি। সামনে মাঠ—তাতে কতগুলো এলোমেলো ঝোপ আর পাঁচ-সাতটা গাছ একসঙ্গে ঝাঁকড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। আরও তাকিয়ে দেখি—কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই।

কী সর্বনাশ—বাঘের মুখে পড়ব নাকি ?

কিন্তু এখানে বাঘ ! এমন সুন্দর রোদ্দুরে ! এমনি চমৎকার সকালে ! ধেৎ !

আর গাছগুলো যে আমলকীর ! কত বড়—কী সুন্দর দেখতে। গোছায় গোছায় যেন মণিমুক্তোর মতো ঝুলছে !

নোলায় জল এসে গেল। নিশ্চয় গাছতলায় আমলকী পড়েছে। যাই—গোটা-কয়েক কুড়িয়ে আনি। আমলকী দেখে বাঘের ভয়-টয় বেমালুম মুছে গেল মন থেকে।

গেলুম গাছতলায় ? ধরেছি ঠিক। বড় বড় পাকা আমলকীতে ছেয়ে আছে মাটি।

বেছে বেছে কয়েকটা কুড়িয়ে নিলুম। তারপর পাশেই একটা সরু মতন লম্বা ডাল পড়ে আছে দেখে—বসলুম তার উপর।

কিন্তু একী ! ডালটা যে কেমন রবারের মতো নরম !

আর তৎক্ষণাৎ ফোঁস করে একটা আওয়াজ। ডালটা নড়ে উঠল, বাঁকা হয়ে চলতে শুরু করে দিলে।

অ্যাঁ !

সাপ—অজগর !

বাপ—রে গেছি ! তড়াক করে এক লাফে আমি গিয়ে একটা কাঁটা-ঝোপের উপর পড়লুম। আর তক্ষুনি দেখলুম বরফির মতো একটা অদ্ভুত মাথা—লকলক করে উঠেছে লম্বা জিভ—আর নতুন নয়া পয়সার মতো দুটো জ্বলজ্বলে চোখ ঠায় তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকেই।

নয়

## এ কার কণ্ঠস্বর ?

সেই নয়া পয়সার মতো চোখ দুটোর দিকে তাকিয়েই তো আমার হয়ে এসেছে। গল্পে শুনেছি, অজগর সাপ অমনিভাবে চোখের দৃষ্টি দিয়ে নাকি হিপ্‌নটাইজ করে ফেলে, তারপর ধীরে-সুস্থে এগিয়ে এসে পাকে পাকে জড়িয়ে একেবারে কপাৎ। অতএব হিপ্‌নটাইজ করার আগেই ধড়মড়িয়ে উঠে আমি তো টেনে দৌড়। দৌড়ই আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি তাড়া

করে আসছে কি না পেছন-পেছন !

না—এল না। এঁকেবেঁকে, সুড়সুড়িয়ে, আস্তে আস্তে নেমে গেল পাশের একটা শুকনো নালার ভেতর।

আধ মাইল দৌড়ে বাগানের মধ্যে এসে যখন থামলুম, তখন আমি আর আমি নেই ! এ কোথায় এলুম রে বাবা ! কথা নেই বার্তা নেই—কোত্থেকে গোদা বাঁদর এসে খপ করে কাঁধ চেপে ধরে—রাত্তিরে জানালার কাছে এসে চিতাবাঘ দাঁত খিঁচিয়ে যায়, আমলকী গাছের তলায় ঘাপটি মেরে ময়াল সাপ বসে থাকে ! আফ্রিকার মতো বিপজ্জনক জায়গায় বেড়াতে এলে এমনি দশাই হয় !

থুড়ি—আফ্রিকা নয়। এ নিতান্তই বাংলাদেশ। কিন্তু এমনভাবে রাতদিন প্যাঁচে পড়ে গেলে কারও কি আর কিছু খেয়াল থাকে—তোমরাই বলো ! তখন মনে হয় আমার নাম প্যালারাম হতে পারে—গদাইচরণ হতে পারে, কেষ্টদাস হওয়াও অসম্ভব নয়। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা গোবরডাঙা হতে পারে, জিব্রাল্টার হতে পারে—জাঞ্জিবার হলেই বা ঠেকাচ্ছে কে ?

দুত্তোর, কিচ্ছুটি ভালো লাগছে না। কেমন উদাস-উদাস হয়ে যাচ্ছি। আর বাঁচব না বলে মনে হচ্ছে। এই আফ্রিকার জঙ্গলে—না-না, আফ্রিকা নয়, এই ম্যাডাগাস্কারের মরুভূমি—দুত্তোর, ম্যাডাগাস্কারও নয়—মানে, এই খুব বিচ্ছিরি জায়গায় আমি নির্ঘাত মারা যাবে। বাঘেই খাক—কি সাপেই ফলার করুক।

মারা যাব—এ-কথা মনে হলেই আমার খুব করুণ সুরে গান গাইতে ইচ্ছে করে। বাগেশ্রী-টাগেশ্রী ওই রকম কোনও একটা সুরে। আচ্ছা, বাগেশ্রী না বাঘেশ্রী ? বেমক্কা বনের মধ্যে বাঘের ছিরি দেখলে গলা দিয়ে কুঁই-কুঁই করে যে-গান বেরোয়—তাকেই বাঘেশ্রী বলে নাকি ? খুব সম্ভব। আর বাঘ যখন গম্ভীর সুরে বলে—হালুম, খাম্—খাম্—তখন সেই সুরটার নাম বোধহয় খাম্বাজ। তাহলে মল্লার গান কি মল্লরা—মানে পালোয়ানরা কুস্তি করবার সময় গেয়ে থাকে ?

কিন্তু মল্লার-ফল্লার চুলোয় যাক। সাপ-বাঘের ফলার হওয়ার আগে বরং মনের দুঃখে ঘরে যাওয়াই ভালো। টেনে দৌড় দেওয়ার ধুকপুকুনি একটু থামলে, আমি খুব মিহি গলায় গাইতে লাগলুম :

'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান—'

বেশ আবেগ দিয়ে গাইছি, চোখে জল আসব-আসব করছে, এমন সময় কানের কাছে কে যেন খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠল :

—আরে খেলে যা ! এই ভরা রোদ্দুরে চাঁদের আলো পেলি কোথায় ?

আর কে ? বেয়াক্কেলে ক্যাবলাটা ! খুব ভাব এসেছিল, একদম গুলিয়ে দিলে। সাধে কি টেনিদা যখন-তখন চাঁদিতে ওর চাঁটি হাঁকড়ে দেয় !

—গোলমাল করছিস কেন ? আমি মারা যাব।

—যা না। কে বারণ করেছে তোকে ? বেশ কায়দা করে—'যা-ই—বি-দায় বি-দায়' বলে মরে যা, আমরা তোর শোকসভা করব। কিন্তু খবরদার, ও-রকম যাচ্ছেতাই সুরে গান গাইবি না !

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, দ্যাখ ক্যাবলা, বেশি ঠাট্টা করিসনি। জানিস—এক্ষুনি একটা অজগর সাপ আমাকে প্রায় ধরে খাচ্ছিল ?

ক্যাবলা বললে, খাচ্ছিল নাকি ? তা খেলে না কেন ? তোকে খেয়ে পাছে পালাজ্বর হয়

এই ভয়েই ছেড়ে দিলে বুঝি ?

—সত্যি বলছি, ইয়া পেল্লায় এক অজগর সাপ—

ক্যাবলা বাধা দিয়ে বললে, বটেই তো। ত্রিশ হাত লম্বা আর সাড়ে চার হাত চওড়া। জানিস আমাকেও এক্ষুনি একটা তিমি মাছ—তা প্রায় পঞ্চাশ হাত হবে—একটা ইঁদুরের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে কপাৎ করে চেপে ধরে আর-কি ! কোনও মতে পালিয়ে বেঁচেছি।

বলে মুখ-ভর্তি শাঁকালুর দোকান দেখিয়ে ক্যাবলার কী হাসি।

—বিশ্বাস হল না—না ?

—কেন এলোমেলো বকছিস প্যালা ? চালিয়াতি একটু বন্ধ কর এখন। কপালজোরে একটা বাঘ না-হয় দেখেই ফেলেছিস, তাই বলে অজগর-গণ্ডার-হিপোপটেমাস-উড়ুক্কু মাছ সব তুই একাই দেখবি ? আমরা দুটো-একটাও দেখতে পাব না ? গপ্প মারতে হয় পটলডাঙায় চাটুজ্যেদের রোয়াকে গিয়ে যা-খুশি মারিস, এখানে ওসব ইয়ার্কি চলবে না। এখন চল—ওরা সবাই তোকে গোরু-খোঁজা করছে।

বেশ, বলব না। কাউকেই কোনও কথা বলব না আমি। এমনকি কুট্টিমামাকেও না। তারপর কালকে একটা মতলব করে সবাইকে ওই আমলকী গাছের দিকে পাঠিয়ে দেব। তখন বোঝা যাবে নালা থেকে অজগর বেরোয়, না ইঁদুরের গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাত তিমি মাছই বেরিয়ে আসে।

সন্ধেবেলায় কুট্টিমামা বললেন, এক-আধটা চিতাবাঘ না মারলে নয়। ভারি উৎপাত শুরু করেছে। আজও বিকেল নাগাদ একটা এসেছিল কুলি লাইনের দিকে। অবিশ্যি কিছু করতে পারেনি—কিন্তু এখন রোজ হাঙ্গামা বাধাবে মনে হচ্ছে।

টেনিদা খুব উৎসাহ করে বললে, তাই করো মামা। গোটা-কয়েক ধাঁ করে মেরে ফেলে দাও, আপদ চুকে যায়।

ক্যবলা বললে, তারপর আমরা সবাই মিলে একটা করে বাঘের চামড়া নেব।

হাবুল বললে, আর সেই চামড়া দিয়া জুতা বানাইয়া মচমচাইয়া হাঁইট্যা যামু।

আমি চটেই ছিলুম। সেই অজগরকে নিয়ে ক্যাবলাটা ঠাট্টা করবার পর থেকে আমার মন-মেজাজ এমন খিঁচড়ে রয়েছে যে কী বলব। আমি বললুম, আর কলার খোসায় পা পড়ে ধপ্‌পাস্ করে আছাড় খামু।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, আচ্ছা—আচ্ছা, আগে বাঘ তো মারা যাক, পরের কথা পরে হবে। আজ কয়েকটা টোটা আনতে পাঠিয়েছি শহরে—নিয়ে আসুক, তারপর কাল বিকেলে বেরুব।

—আমরাও যাব তো সঙ্গে ?—ফস করে জিজ্ঞেস করল ক্যাবলা।

শুনেই তো আমার পেটের মধ্যে গুরুগুরিয়ে উঠেছে। আগে যেটুকু-বা সাহস ছিল, জানালার পাশে বাঘ এসে দাঁড়াবার পর থেকে সমানে ধুকপুক করছে বুকের ভেতরটা। তারপর ওই বিচ্ছিরি সাপটা। নাঃ, শিকারে গেলে আমাকে আর দেখতে হবে না। পটলডাঙার প্যালারামের কেবল বারোটা নয়—সাড়ে দেড়টা বেজে যাবে। বাঁচালেন কুট্টিমামাই।

—সে হরিণ শিকার হলে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু চিতাবাঘ বড্ড শয়তান। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই ওদের।

টেনিদাও বোধহয় মওকা খুঁজছিল। বললেন, আমরা তো শিকার করবার জন্যেই এসেছিলুম। কিন্তু কুট্টিমামার অসুবিধে হলে কী আর করা যায়—মনে ব্যথা পেলেও

বাংলোতেই বসে থাকব।

ক্যাবলা বললে, সমঝ গিয়া। তোমার ভয় ধরেছে, তাই না যেতে পারলে বাঁচো। ওরা থাকুক মামা—আমি সঙ্গে যাব।

হাবলা সঙ্গে সঙ্গেই পোঁ ধরলে : হঃ—ক্যাবলা সাহস কইর‍্যা যাইতে পারব—আর আমি পারুম না! আমারেও লইতে হইব।

আমার যে কী বিচ্ছিরি স্বভাব—ওদের উৎসাহ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আমারও দারুণ তেজ এসে যায়। তখন মনে হয় পালাজ্বর-ফালাজ্বর পিলে-টিলে কিচ্ছু না—আমি সাক্ষাৎ ভীম-ভবানী, এক্ষুনি গরিলার সঙ্গে দমাদম বক্সিং লড়তে পারি। মনে হয়, মনের দুঃখে মরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না—মরি তো একটা কিছু করেই মরব।

একটু আগেই ভয় ধরে গিয়েছিল, হঠাৎ বুক চিতিয়ে বলে ফেললুম, আমিও যাব—নিশ্চয় যাব!

টেনিদা কেমন করুণ চোখে আমাদের দিকে তাকাল। তারপর ঘাড়-টাড় চুলকে নিয়ে বললে, সবাই যদি যায়—তবে আমিই আর বাদ থাকি কেন?

ক্যাবলা বললে, কিন্তু তুমহারা ডর লাগ গিয়া।

—ডর? হেঁঃ! আমি পটলডাঙার টেনি শর্মা—আমি ভয় করি দুনিয়ায় এমন কোন—

কথাটা শেষ হতেও পেল না। হঠাৎ বাইরে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে এক বিটকেল আওয়াজ। টেনিদা তড়াং করে লাফিয়ে উঠল : ও কী—ও কী মামা?

কুট্টিমামা কী যেন বলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে গেলেন। আমরা দেখলুম তাঁর মুখের চেহারা কেমন পাল্টে গেছে—দু'চোখে অমানুষিক ভয়ের ছাপ।

কুট্টিমামা কেবল ফিসফিস করে বললেন, সর্বনাশ—কী সর্বনাশ। তারপর এক হাতে গলাটা চেপে ধরলেন।

বাইরে আবার চ্যাঁ-চ্যাঁ করে সেই বীভৎস ধ্বনি। আর কুট্টিমামার আতঙ্কে স্তব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে আমরাও একটা রহস্যময় ভয়ের অতলে ডুবে যেতে লাগলুম।

বাইরে ও কী ডাকল? কোন্ অদ্ভুত আতঙ্ক—কোন্ ভয়াল ভয়ঙ্কর?

দশ

## টেনিদার বিদায়

খানিক পরে হাবুল সেনই সামলে নিলে। মামার কপালে-তোলা মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হইল মামা? অমন কইর‍্যা চক্ষু আকাশে তুইল্যা বইস্যা আছেন ক্যান? কী ডাকল বাইরে? ভূত না রাইক্ষস?

কুট্টিমামার মুখখানা এবার ভীষণ ব্যাজার হয়ে গেল।

—দূর কী আর ডাকব? ও তো প্যাঁচা।

—প্যাঁচা!—ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, তাতে আপনি ভয় পেলেন কেন?

—ভয় পেলুম কখন?

আমি বললুম, বা-রে, এই তো আপনি বললেন, কী সর্বনাশ—কী সর্বনাশ! তারপরেই ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন।

—আরে, ঘাবড়ে গেছি সাধে?—কুট্টিমামার ব্যাজার মুখটা আরও ব্যাজার হয়ে গেল :

একটা বাঁধানো দাঁত ছিল, সেটা গেল খুলে আর মনের ভুলে ক্লিপ-টিপসুদ্ধ সেটাকে টক করে গিলে ফেললুম ! যাই—এক্ষুনি একটা জোলাপ খেয়ে ফেলি-গে।

কুট্টিমামা উঠে চলে গেলেন।

হাবুল বললে, দাঁতটা প্যাটে থাকলেই বা ক্ষতি কী ! মামার তো সুবিধাই হইল। যা খাইব তারে ডবল চাবান দিতে পারব : একবার চাবাইব মুখে, আর একবার কইস্যা প্যাটের মধ্যে চাবান দিতে পারব।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, চুপ কর, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না ! কাল আমি তোকে একটা দেশলাই, খানিক সর্ষের তেল আর আধসের বেগুন গিলিয়ে দেব। পেটের মধ্যে বেগুন ভাজা করে খাস !

ছোট্টুলাল এসে বললে, খানা তৈয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পড়লুম আমরা। টেনিদা বললে, কেয়া বানায়া আজ ?

ছোট্টুলাল বললে, ডিমের কারি, মাছের ফ্রাই—

টেনিদা বললে, ট্রা-লা-লা-লা-লা ! কাল তো শিকারে যাচ্ছি। আমরা বাঘের পেটে যাব, না হিপোপটেমাসেই গিলে খাবে কে জানে ! চল—আজ প্রাণ ভরে ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিই !

ক্যাবলা বলতে যাচ্ছিল, ডুয়ার্সের জঙ্গলে কি হিপো—

কিন্তু বলবার সুযোগ পেলে না। তার আগে টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : ডি-লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—

আমরা কোরাস তুলে বললুম, ইয়াক-ইয়াক !

আর ছোট্টুলাল চোখ দুটোকে আলুর দমের মতো করে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সকালে উঠেই সাজ-সাজ রব।

দেখি, বেশ বড় একটা মোটর ভ্যান এসে গেছে। ওদিকে কুট্টিমামা বুট আর হাফপ্যান্ট পরে একেবারে তৈরি। গলায় টোটার মালা—হাতে বন্দুক। কুলিদের সর্দারও এসে হাজির—তারও হাতে একটা বন্দুক। সর্দারের নাম রোশনলাল।

মামা বললেন, রোশনলাল খুব পাকা শিকারি। ওর হাতের তাক ফস্কায় না।

আমরাও চটপট কাপড়-জামা পরে নিলুম। কিন্তু টেনিদার আর দেখা নেই।

কুট্টিমামা বললেন, টেনি কোথায় ?

টেনিদা—ভদ্রভাষায় যাকে বলে বাথরুম—তার মধ্যে ঢুকে বসে আছে। আর বেরুতেই চায় না। শেষে দরজায় দমাদম ঘুষি চালাতে লাগল ক্যাবলা।

—শিকারে যাওয়ার আগেই কি অজ্ঞান হয়ে গেলে নাকি টেনিদা ? যদি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে থাকো, দরজা খুলে দাও। আমরা তোমার নাকে স্মেলিং সল্ট লাগিয়ে দিচ্ছি।

এর পরে কোনও ভদ্রলোকই অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে না। রেগে-মেগে দরজা খুলে বেরিয়ে এল টেনিদা।

—টেক কেয়ার ক্যাবলা—কে বলে আমি অজ্ঞান হয়েছি ? কেবল পেটটা একটু চিন-চিন করছিল—

কুট্টিমামার হাঁক শোনা গেল : কী হল টেনি—রেডি ?

হাবুল বললে, টেনিদার প্যাট চিন-চিন করে।

আমি বললুম, মাথা ঝিন-ঝিন করে—

ক্যাবলা বললে, বাঘ দেখার আগেই প্রাণ টিন-টিন করে।

টেনিদা ঘুষি বাগিয়ে ক্যাবলাকে তাড়া করলে—ক্যাবলা পালিয়ে বাঁচল।

হাঁড়ির মতো মুখ করে টেনিদা বললে, ভাবছিস আমি ভিতু ? আচ্ছা—চল শিকারে। পটলডাঙার এই টেনি শর্মা কাউকে কেয়ার করে না। বাঘ-ফাগ যা সামনে আসবে—স্রেফ হাঁড়িকাবাব করে খেয়ে নেব দেখে নিস।

টেনিদার মজাই এই। ঠিক হাওড়া স্টেশনের গাড়িগুলোর মতো। লিলুয়া পর্যন্ত যেন চলতেই চায় না—খালি ক্যাঁচ—খালি কোঁচ। তারপর একবার দৌড় মারল তো পাঁই-পাঁই শব্দে সোজা বর্ধমান—তখন আর কে তার পাত্তা পায়। এই গুণের জন্যেই তো টেনিদা আমাদের লিডার।

যাই হোক, আমরা বেরিয়ে পড়লুম। কুট্টিমামা আর রোশনলাল বসলেন ড্রাইভারের পাশে, আমরা বসলুম ভ্যানের ভিতর। একটু পরেই গাড়ি এসে জঙ্গলে ঢুকল।

দু'দিকে বড় বড় শাল গাছ—তাদের তলায় নানা আগাছার জঙ্গল। এখানে-ওখানে নানা রকমের ফুল ফুটেছে, মাথা তুলে আছে ডোরাকাটা বুনো ওলের ডগা। ছোট ছোট কাকের মতো কালো কালো একরকম পাখি রাস্তার উপর দিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে—ছোট-ছোট নালা দিয়ে তিরতির করে বইছে পরিষ্কার নীলচে জল।

সামনে দিয়ে কয়েকবার কান খাড়া করে দৌড়ে পালাল খরগোশ। মাথা নিচু করে তীরের গতিতে ছুটে গেল একটা হরিণ, সোনালি লোমের ওপর কী সুন্দর কালো কালো ছিট।

কুট্টিমামা বললেন, ইস-ইস! আর একটু হলেই মারতে পারা যেত হরিণটাকে!

কথাটা আমার ভালো লাগল না। এমন সুন্দর হরিণগুলোকে মানুষ কেন মারে! দুনিয়ায় তো খাবার জিনিসের অভাব নেই। দুমদাম করে হরিণ না মারলে কী এমন ক্ষতিটা হয় লোকের ?

পাশের শিমুল গাছের ডালে বড় একটা পাখি ডেকে উঠল।

ক্যাবলা হাততালি দিয়ে বললে, ময়ূর—ময়ূর!

ময়ূরই বটে। ঠিক চিনেছি আমরা। অনেক ময়ূর দেখেছি চিড়িয়াখানায়।

বাঘের কথা ভুলে গিয়ে আমার ভারি ভালো লাগছিল জঙ্গলটাকে। কী সুন্দর—কী ঠাণ্ডা ছায়ায় ভরা! কত ফুল—কত পাখির মিষ্টি ডাক—কত খরগোশ—কত হরিণ! ইচ্ছে করছিল পাহাড়ি নালার ওই নীলচে ঝর্নার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্নান করি।

হঠাৎ চমক ভাঙল রোশনলালের গলার আওয়াজ।

—বাবু—বাবু!

কুট্টিমামা বললেন, হুঁ—দেখেছি।...বাহাদুর, গাড়ি রোখো।

গাড়িটা আস্তে আস্তে থেমে গেল। মামা আর রোশনলাল নামলেন গাড়ি থেকে।

মামা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা চুপচাপ বসে থাকো গাড়িতে। কাচ তুলে দাও। নেহাত দরকার না পড়লে নামবে না। আমরা আসছি একটু পরে।...বাহাদুর—তুম ভি আও—

মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে দেখতে তিনজনে টুপ করে মিলিয়ে গেল বনের ভিতর।

আমরা চারমূর্তি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম ভ্যানের ভিতর। কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে বোকার মতো বসে থাকতে ভালো লাগে ? কাচ তুলে দেওয়াতে কেমন গরমও বোধ হচ্ছিল। অথচ বাইরে ঠাণ্ডা ছায়া—হাওয়া বইছে ঝিরঝিরিয়ে, টুপটুপিয়ে পড়ছে শালের পাতা। আমরা যেন জেলখানার মধ্যে আটকে আছি—এমনি মনে হচ্ছিল।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, একটু নেমে পায়চারি করলে কেমন হয় ?

টেনিদা বললে, কুট্টিমামা বারণ করে গেল যে ! কাছাকাছি যদি বাঘ-টাঘ থাকে—

হাবুল বললে, হঃ ! এমন দিনের ব্যালা—চাইরদিক এমন মনোরম—এইখানে বাঘ থাকব ক্যান ? আর বাঘ যদি এইখানেই থাকব—তাইলে অরা বাঘের খোঁজে দূরে যাইব ক্যান ?

পাকা যুক্তি। শুনে টেনিদা একবার কান, আর একবার নাকটা চুলকে নিলে। বললে, তা বটে—তা বটে ! তবে, মামা বারণ করে গেল কিনা—

ক্যাবলা বললে, মামারা বারণ করেই। সংস্কৃতে পড়োনি টেনিদা ? 'মা'—'মা'—অর্থাৎ কিনা, না—না। ওটা মামা নামের গুণ—সবটাইতে 'মা—মা' বলবে।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, ধ্যাত্তোর সংস্কৃত ! ইস্কুলে পণ্ডিতের চাঁটিতে চোখে অন্ধকার দেখতুম—কলেজে এসে সংস্কৃতের হাত থেকে বেঁচেছি ! তুই আর পণ্ডিতি ফলাসনি ক্যাবলা—গা জ্বালা করে !

ক্যাবলা বললে, তা জ্বালা করুক। তো ম্যায় উতার বাঁউ ?

—সে আবার কী ? হাউ-মাউ করছিস কেন ?

—হাউ-মাউ নয়—রাষ্ট্রভাষা। মানে, নামব ?

—সোজা বাংলায় বললেই হয় !—টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, অমন ভুতুড়ে আওয়াজ করছিস কেন ? আয়—নামা যাক। কিন্তু বেশি দূর যাওয়া চলবে না—কাছাকাছিই থাকতে হবে।

আমরা নেমে পড়লুম ভ্যান থেকে।

বেশি দূর আর যাব না ভেবেও হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা এগিয়েছি। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য-টিশ্য দেখে আমি বেশ কায়দা করে বলতে যাচ্ছি ; 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর—' ঠিক এমন সময়—

জঙ্গলের মধ্যে কেমন মড়-মড় শব্দ। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি—

হাতি ! গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই !

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম : টেনিদা—বুনো হাতি !

বাপরে—মা-রে ! কিন্তু ভ্যানের দিকে যাবার উপায় নেই—হাতি পথ জুড়ে এগিয়ে আসছে !

—ক্যাবলা, হাবুল, প্যালা—গাছে, গাছে—উঠে পড়—কুইক্—টেনিদার আদেশ শোনা গেল।

কিন্তু তার আগেই আমরা সামনের একটা মোটা গাছে তর-তর করে উঠতে আরম্ভ করেছি। যেভাবে তিন লাফে আমরা গাছে চড়ে গেলুম, তা দেখে কে বলবে আমাদের পেছনে একটা করে লম্বা ল্যাজ নেই।

হাতিটা তখন ঠিক গাছটার তলায় এসে পড়েছে। আর সেই মুহূর্তেই অঘটন ঘটল একটা। মড়মড় করে ডাল ভাঙবার আওয়াজ এল, একটা চিৎকার শোনা গেল টেনিদার, তারপর—

তারপর রোমাঞ্চিত হয়ে আমরা দেখলুম, টেনিদা পড়েছে হাতির পিঠের ওপর। উপুড় হয়ে দু'হাতে চেপে ধরেছে হাতির গলার চামড়া। আর পিঠের উপর খামকা এই উৎপাতটা ভাদ্রমাসের পাকা তালের মতো নেমে আসাতে হাতিটা ছুট লাগিয়েছে প্রাণপণে।

আমরা আকুল হয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম : টেনিদা—টেনিদা—

হাতি জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার আগে আমরা শুনলুম টেনিদা ডেকে বলছে : তোদের পটলডাঙার টেনিদাকে তোরা এবার জন্মের মতো হারালি ! বিদায়—বিদায়—

এগারো

## অভিযানের আরম্ভ

গাছের উপর বসে আমরা তিন মূর্তি একসঙ্গে কেঁদে ফেললুম।

টেনিদা—আমাদের লিডার—পটলডাঙার চার মূর্তির সেরা মূর্তি—এমনি করে বুনো হাতির পিঠে চেপে বিদায় নিলে। এ আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না—কেউ না।

টেনিদা আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক মিষ্টি আর বিস্তর ডালমুট খেয়েছে। চাঁটি গাঁট্টা লাগিয়েছে যখন-তখন। কিন্তু টেনিদাকে নইলে আমাদের যে একটি দিনও চলে না। যেমন চওড়া বুক—তেমনি চওড়া মন। হাবুল সেবার যখন টাইফয়েড হয়ে মরো-মরো তখন সারারাত জেগে, নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে টেনিদাই তাকে নার্স করেছে—বাঁচিয়ে তুলেছে বলা চলে। পাড়ার কারও বিপদ-আপদ হলে টেনিদাই গিয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের আগে। লোকের উপকারে এক মুহূর্তের জন্য তার ক্লান্তি নেই—মুখে হাসি তার লেগেই আছে। ফুটবলের মাঠে সেরা খেলোয়াড়, ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন। আর গল্পের রাজা। এমন করে গল্প বলতে কেউ জানে না।

সেই টেনিদা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে? এ হতেই পারে না। এ অসম্ভব।

ক্যাবলাই চোখের জল মুছে ফেলল সকলের আগে। ডাকলে, হাবল।

—কী কও?—ধরা গলায় হাবুল জবাব দিলে।

—কেঁদে লাভ নেই। টেনিদাকে খুঁজে বের করতে হবে।

—কোথায় পাবে?—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

—যেখানেই হোক।

ফোঁস-ফোঁস করতে করতে হাবুল বললে, বুনো হাতি—কোথায় যে লইয়া গেছে—

ক্যাবলা ততক্ষণে নেমে পড়েছে গাছ থেকে। বললে, পৃথিবীর বাইরে তো কোথাও নিয়ে যায়নি। দরকার হলে দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব। নেমে আয় তোরা।

আমরা নামলুম।

ক্যাবলা বললে, শোনো বন্ধুগণ। আমরা পটলডাঙার ছেলে, ভয় কাকে বলে কোনও দিন জানিনি। তোমরা নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভুলে যাওনি সেই ঝণ্টিপাহাড়ির অভিযানকাহিনী—নিশ্চয় ভুলে যাওনি, স্বামী ঘুটাঘুটানন্দের চক্রান্ত আমরা কেমন করে ফাঁস করে দিয়েছিলুম। মানুষের শয়তানিকে ঠাণ্ডা করতে পেরেছি, আর বুনো জানোয়ারকে ভয়? জানোয়ার মানুষের চাইতে নিচুদরের জীব—তাকে হারিয়ে, হটিয়েই মানুষ এগিয়ে চলেছে। আমরাও টেনিদাকে ফিরিয়ে আনবই।

—যদি হাতি তাকে মেরে ফেলে থাকে?

—আমি তা বিশ্বাস করি না। সে আমাদের লিডার—বিপদে পড়লে যেমন বেপরোয়া তেমনি সাহসী হয়ে ওঠে—সে তো তোমরা জানোই। সে ঠিকই বেঁচে আছে। তবু আমাদের কর্তব্য আমরা করব। আর—আর যদি দেখি সত্যিই হাতি তাকে মেরে ফেলেছে, তা হলে আমরাও মরব। টেনিদাকে ফেলে আমরা কিছুতেই কলকাতায় ফিরে যাব না। কী বল তোমরা?

আমরা দু'জনে বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়ালুম।

—ঠিক। আমিও তাই কই।—হাবুল বললে।

—চারজন এসেছিলুম—তিনজন কিছুতেই ফিরে যাব না। মরলে চারজনেই

মরব। —আমি বললুম।

ক্যাবলা বললে, তা হলে এখনি আমরা বেরিয়ে পড়ি।

—কিন্তু কুট্টিমামা আর রোশনলালকে খবর দিতে পারলে—

—কোথায় খবর দিবি, আর পাবিই বা কোথায় ? তা ছাড়া এক সেকেন্ডও আমরা সময় নষ্ট করতে পারব না। চল, এগোনো যাক—

—কোন্‌দিকে যাবি ?—হাবুল জানতে চাইল।

—হাতির পায়ের দাগ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তাই ধরেই এগোব।

আমি বললুম, একটা বন্দুক-টন্দুক যদি থাকত—

ক্যাবলা রাগ করে বললে, তুই আর এখন জ্বালাসনি প্যালা ! বন্দুক থাকলেই বা কী হত শুনি—কোনও জন্মে আমরা কেউ ছুঁড়েছি নাকি ও-সব ? বন্দুক আমাদের দরকার নেই, মনের জোরই হল সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আয়—

—চল—

আমরা এগিয়ে চললুম। বুক এক-আধটু দুর-দুর না করছিল তা নয়, মনে হচ্ছিল পটলডাঙায় ফিরে গিয়ে বাবা-মা ভাইবোনদের মুখও হয়তো কোনওদিন আর দেখতে পাব না। হয়তো এ-জঙ্গলেই বাঘ ভালুক হাতির পাল্লায় আমার প্রাণ যাবে। যদি যায়—যাক। দুনিয়ায় ভীরু আর স্বার্থপরদের কোনও জায়গা নেই। ও-ভাবে বাপ-মা'র কোলে আহ্লাদে পুতুল হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে বীরের মতো মরা ভালো। আর, একবার ছাড়া তো দু'বার মরব না।

ক্যাবলা ঠিকই বুঝেছিল। ডালপালা ভেঙে, গাছপালা মাড়িয়ে হাতিটা যেভাবে এগিয়ে গেছে আমরা তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলুম। কোথাও কোথাও নরম মাটিতে তার পায়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমরা বনের পথ বেয়ে চলতে লাগলুম। কিন্তু তখনও হাতির দেখা নেই, টেনিদারও চিহ্নমাত্রও না।

শেষে এক জায়গায় এসে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হল।

চারধারে জঙ্গল কেমন তচনচ। চার পাশেই হাতির পায়ের দাগ। মনে হয়, পাঁচ-সাতটা হাতি জড়ো হয়েছিল এখানে তারপর নানা দিকে যেন তারা ঘুরে বেড়িয়েছে। এর মধ্যে কোন্ হাতিটার পিঠে টেনিদা গদিয়ান হয়ে বসে আছে—সে কথা কে বলবে !

ক্যাবলা বললে, তাই তো ! কোন্ দিকে যাই ?

হাবুল ভেবেচিন্তে বলল, এইভাবে ঘুর‍্যা খুব সুবিধা হইব না। চল ক্যাবলা, আবার ভ্যানের কাছে ফির‍্যা যাই। মামারে সঙ্গে কইর‍্যা—

ক্যাবলা বললে, না।

—কী করবি তা হলে ?—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

—তিনজনে তিনদিকে যাব।

—একা-একা ?

—হ্যাঁ—একলা চল রে।

আমার পালাজ্বরের পিলেটা অবশ্য এতদিনে অনেক ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু যেটুকু আছে তা-ও চড়াৎ করে লাফিয়ে উঠল।

—একা যাব ?

ক্যাবলা দুটো জ্বলজ্বলে চোখ মেলে আমার দিকে চাইল।

—তুই ভ্যানে ফিরে যা প্যালা। আমি আর হাবুল চললুম খুঁজতে।

আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল। আমি ভীরু ! একা আমারই প্রাণের ভয় ! কখনও না।

বললুম, তোর ইচ্ছে হয় তুই ফিরে যা। আমি টেনিদাকে খুঁজব।

ক্যাবলা আমার পিঠ চাপড়ে দিলে। খুশি হয়ে বললে, ব্যস, ঠিক হ্যায়। ই হ্যায় মরদকা বাত! এবার তিনজন তিনমুখে। বন্ধুগণ, হয়তো আমাদের এই শেষ দেখা। হয়তো আমরা আর কেউ বেঁচে ফিরব না। তাই যাওয়ার আগে একবার বল—

—পটলডাঙা—

—জিন্দাবাদ!

—চার মূর্তি—

—জিন্দাবাদ!

তারপরেই দেখি, ওরা দু'জনে দু'দিকে বনের মধ্যে সুট করে কোথায় চলে গেল। আমি এখন একা। এই বাঘ-সাপ-হাতির জঙ্গলে একেবারে একা। নিজেকে বললুম, বুকে সাহস আনো পটলডাঙার প্যালারাম! তুমি যে কেবল শিঙিমাছ দিয়েই পটোলের ঝোল খেতে এক্সপার্ট তা নও, তার চাইতে আরও অনেক বেশি। আজ তোমার চরম পরীক্ষা। তৈরি হও সেজন্যে।

একটা শুকনো ডাল পড়ে ছিল সামনে। সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে আমিও চলতে শুরু করলুম। মরবার আগে অন্তত কষে এক ঘা তো বসাতে পারব! সে হাতিই হোক আর বাঘই হোক।

কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না আমাকে।

একটা ঝোপের ওপর যেই পা দিয়েছি, অমনি—

সড়াক্—ঝরঝরাৎ—

পায়ের তলার থেকে মাটি সরে গেল। আর তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলুম, মহাশূন্য বেয়ে আমি কোথায় কোন পাতালের দিকে পড়ে যাচ্ছি।

—মা—

তারপরেই আমার চোখ বুজে এল।

## বারো

## শজারু সঙ্গীত

গর্তে পড়ে মনে হয়েছিল—পটলডাঙার প্যালারাম এবার একদম ফিনিশ—হাড়গোড় কিছু বুঝি আর রইল না। 'মরে গেছি—মরে গেছি'—ভাবতে ভাবতে দেখি, আমি মোটেই মারা যাইনি। দিব্যি বহাল তবিয়তে একরাশ নরম কাদার ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছি—পিঠটা ঠেস দেওয়া রয়েছে মাটির দেওয়ালে।

কোমরটা কেবল একটু ঝনঝন করছে—মাথাতেও ঝাঁকুনি লেগেছে। সেটুকু সামলে নিয়ে চোখ মেলে তাকালুম। মাথার হাত-দশেক ওপরে একটা গোল আকাশ—আরও ওপরে একটা গাছের ডাল দুলছে। আশেপাশে চেয়ে দেখলুম অন্ধকার, গর্তটা কত বড় কিংবা আমি ছাড়া এর ভেতরে আর কী আছে, কিচ্ছু বুঝতে পারলুম না।

এমন সময় খুব কাছেই যেন একটা ঝমঝম করে শব্দ শুনতে পেলুম। ঠিক মনে হল কেউ যেন হাতে করে টাকার তোড়া বাজাচ্ছে।

আমার খাড়া খাড়া কান দুটো আরও খাড়া হয়ে উঠল। ব্যাপারখানা কী?

গর্তে যখন পড়েছি তখন তো মারাই গেছি। কিন্তু মরবার আগে সব ভালো করে জেনেশুনে নেওয়া দরকার, কারণ বইতেই পড়েছি : 'মৃত্যুকাল পর্যন্ত জ্ঞান সঞ্চয় করিবে।' ওটা কীসের আওয়াজ ?

মাথায় ঝাঁকুনি লাগবার জন্যেই বোধহয় চোখ এখনও ঝাপসা হয়ে রয়েছে। খুব লক্ষ করেও একদিকে ছোট একটা ছায়ার মতো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না। কিন্তু আবার শুনলুম কে যেন ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে, আর শব্দ উঠছে : ঝম-ঝম-ঝম—

অ্যাঁ—যখের গর্ত নাকি ?

ভাবতেই আমার কানের ভেতরে গুবরে পোকারা কুর কুর করতে লাগল, নাকের ওপর যেন উচ্চিংড়ে লাফাতে লাগল, পেটের মধ্যে ছোট-হয়ে-যাওয়া সেই পালাজ্বরের পিলেটা কচ্ছপের মতো শুঁড় বের করতে লাগল। শেষকালে কি পাতালে যখের রাজ্যে এসে পৌঁছে গেলুম ? সেই কি অমন করে মোহরের থলি বাজিয়ে আওয়াজ করছে ? একটু পরেই থলিটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলবে : বৎস প্যালারাম, অনেক কষ্ট করে তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ দেখে ভারি খুশি হয়েছি, এবার এই মোহর নিয়ে তুমি দেশে চলে যাও—বিরাট অট্টালিকা বানাও—ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি—

হাতির কথা ভাবতেই মনে হল, আমাদের লিডার টেনিদা বুনো হাতির পিঠে চড়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। আমরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু কোথায় টেনিদা—আমিই বা কোথায় ? এই বিচ্ছিরি আফ্রিকার জঙ্গলে—না-না, ম্যাডাগাস্কারের অরণ্যে—দুত্তোর ডুয়ার্সের এই যাচ্ছেতাই বনের ভেতর, আমাদের চারমূর্তিরই বারোটা বেজে গেল।

সব ভুলে গিয়ে আমার এখন একটু একটু কান্না পেতে লাগল। মা'কে মনে পড়ছে, বাবা, ছোড়দি, বড়দা, ছোট বোন দুটোকে মনে পড়ছে, এমনকি, যে-মেজদা একবার পেট কামড়েছে বললেই দেড় হাত লম্বা একটা সিরিঞ্জ নিয়ে আমার পেটে ইঞ্জেকশন দিতে আসে, তাকেও মনে পড়ে যাচ্ছে। খুব ছোটবেলায় বড়দা একবার আমায় বলেছিল ঘড়ি দেখে আসতে। ঘড়ি দেখে এসে আমি খুব গম্ভীর চালে বলেছিলুম, সাড়ে দেড়টা বেজেছে, আর শুনেই বড়দা আমার একটা লম্বা কানে তিড়িং করে চিড়িং মেরে দিয়েছিল। হায়—বড়দা আর কোনও দিন অমন করে আমার কানে মোচড় দেবে না !

বারোটা নয়, এবার সত্যিই আমার সাড়ে দেড়টা বেজে গেল।

আবার সেই ঝমঝম শব্দ ! চমকে উঠলুম।

চোখটা মুছে চাইতে এবার আমার জ্ঞান লাভ হয়। ধ্যেৎ—যখ-টখ কিচ্ছু না—সব বোগাস। এতক্ষণে গর্তের ভেতরকার অন্ধকারটা চোখে খানিকটা ফিকে হয়ে এসেছে। দেখলুম বেড়ালের চাইতে একটু বড় কী একটা জন্তু হাত-চারেক দূরে দাঁড়িয়ে সমানে ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ করছে। তার খুদে-খুদে চোখ দুটো অন্ধকারে চিকচিক করছে—আর তার সারা শরীরে মোটা মোটা ঝাঁটার কাঠির মতো কী সব খাড়া হয়ে রয়েছে।

আমি বলে ফেললুম, তুই আবার কে রে ? ঝাঁটা-বাঁধা বেড়ালের মতো দেখতে ?

শুনেই জন্তুটা গা-ঝাড়া দিলে। আর তক্ষুনি আওয়াজ হল : ঝন-ঝম—ঝুমুর-ঝুমুর।

আরে, তাই বল ! এইবারে বুঝেছি। মিস্টার শজারু। ছেলেবেলায় মল্লিকা মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম শক্তিগড়ে। ওঁদের বাড়ির পাশে আমবাগানে রাত্তির বেলা শজারু ঘুরে বেড়াত আর ভয় পেলেই কাঁটা বাজিয়ে আওয়াজ করত ঝুম-ঝুম। মল্লিকা মাসিমা বলতেন, শজারুর মাংস খেতে খুব ভালো। যখন কাঁটা উঁচিয়ে দাঁড়ায়, তখন দুম করে ওর পিঠের উপর একটা কলাগাছ ফেলে দিতে হয়। ব্যস—জব্দ। কাঁটা কলাগাছে আটকে

যায়—আর পালাতে পারে না।

বুঝতে পারলুম, আমি পড়বার আগে শজারু মশাইও কী করে গর্তে পড়েছেন। তাই আমি আসাতে খুব রাগ হয়েছে—ভাবছেন, আমিই বুঝি প্যাঁচ কষিয়ে ওঁকে ফেলে দিয়েছি। তাই খুব কাঁটা ফুলিয়ে আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে।

আমার খুব মজা লাগল। থাকত কলাগাছ—লম্ফঝম্ফ তোমার বেরিয়ে যেত! এখন দাপাদাপি করো—যত ইচ্ছে!

আরে, মারা যখন গেছিই, তখন আর ভাবনা কী! শজারুটার ফোঁসফোঁসানি দেখে আমার দস্তুরমতো গান পেয়ে গেল। তোমরা তো জানোই—দেখতে আমি রোগা-পটকা হলে কী হয়—গান ধরলে আমার গলা থেকে এমনি হালুম্ব রাগিণী বেরুতে থাকে যে ক্যাবলাদের রামছাগলটা পর্যন্ত দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে ম্যা-হা-হা বলে চিৎকার ছাড়ে। শজারুটা যাতে তেড়ে এসে আমাকে কয়েকটা খোঁচা-টোচা না লাগিয়ে দেয়, সেজন্যে ওকে ভেবড়ে দেবার জন্যে 'আমি হাউ-মাউ করে 'হ-য-ব-র-ল' থেকে গাইতে শুরু করলাম :

'বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই শজারু,
আজকে রাতে হবে একটা মজারু—'

সেই বন্ধ গর্তের ভেতর আমার বেয়াড়া গলার বাজখাঁই গান যে কেমন খোলতাই হল—সে বোধহয় না বললেও চলে। এমন পিলে-কাঁপানো আওয়াজ বেরুল যে শুনে নিজেই আমি চমকে গেলুম। শজারুটা তিড়িক করে একটা লাফ মারল।

এই রে, তেড়ে আসে নাকি আমার দিকে! ওর গোটা-কয়েক কাঁটা গায়ে ফুটিয়ে দিলেই তো গেছি—একেবারে ভীষ্মের শরশয্যা! প্রাণের দায়ে জোর গলা-খাঁকারি দিয়ে আবার আরম্ভ করলুম :

'আসবে সেথায় প্যাঁচা এবং প্যাঁচানি—'

শজারুটা এবার কেমন একটা আওয়াজ করলে। তারপর আমার দিকে আর না এগিয়ে—সুড়সুড়িয়ে আরও পেছনে সরে গেল, কাঁটা ফুলিয়ে কোণে গোল হয়ে বসে রইল। আমার গানের গুঁতোয় আপাতত বিপর্যস্ত হয়ে গেছে মনে হল—সহজে যে আর আক্রমণ করবে এমন বোধ হচ্ছে না।

ও থাক বসে। আমিও বসি।

কিন্তু আমিও বসব? বসে থেকে আমার কী লাভ? আমি তো এখনও মরিনি! উপর থেকে হাত-দশেক নীচে একটা গর্তের মধ্যে পড়েছি বটে, তাই বলে এখনও তো আমার পঞ্চত্ব পাওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। একটু চেষ্টা করলে হয়তো আরও কিছুদিন শেয়ালদা বাজারের শিঙিমাছ আর কচি পটোল সাবাড় করবার জন্যে আমি বেঁচে থাকতে পারি।

আর শুধু নিজের বাঁচাটাই কি বড় কথা? আমাদের বাংলার প্রফেসর একদিন পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন, 'নিজের জন্যে বাঁচে জানোয়ারেরা, সকলের জন্য বাঁচে মানুষ।' আমি পটলডাঙার প্যালারাম—রোগা-পটকা হতে পারি, ভিতু হতে পারি, কিন্তু আমি মানুষ। খালি আমার নিজের কথাই তো ভাবলে চলবে না! আমাদের লিডার টেনিদাকে যেমন করে হোক উদ্ধার করতে হবে, চার মূর্তির আর সবাই কোথাও যদি কেউ বিপদে পড়ে থাকে—তাদের বাঁচাতে হবে। আমি বাঁচব—সকলের জন্যেই বাঁচব!

গর্তের কোনায় গোল-হয়ে-বসে-থাকা শজারুটা কেমন ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে উঠল। আমার মনে হল, যেন রাষ্ট্রভাষায় বললে, 'কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ!' অর্থাৎ কিনা—শাবাশ, শাবাশ!

আবার মাথা তুলে চাইলুম।

ওপরে গর্ত জুড়ে সেই গোল আকাশটুকু। একটা গাছের ডাল নেমে এসেছে, তার পাতা

কাঁপছে ঝিরঝিরিয়ে। পারব না—একটু চেষ্টা করলে উঠে যেতে পারব না? তেনজিং এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারলেন—আমি একটা গর্ত বেয়ে উঠে যেতে পারব না ওপরে? তেনজিংয়ের তো আমার মতো দু'খানা হাত আর দু'খানা পা-ই ছিল! তবে?

দেখিই না একবার চেষ্টা করে। সেই-যে বইতে আছে না, 'যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে?' মাটির ভেতর দিয়ে আছড়ে পড়েছি, মাটি ধরেই উঠে যাব।

যা থাকে কপালে বলে উঠতে যাচ্ছি, আর ঠিক তখন—

হঠাৎ কানে এল বন-বাদাড় ভেঙে কে যেন দুড়দাড় করে ছুটে আসছে। তার পরেই হুড়মুড়—সরসর—ঝরঝর করে আওয়াজ। ঠিক মনে হল, গোল আকাশটা তালগোল পাকিয়ে নীচে আছড়ে পড়ল। আমার মুখ-চোখে ধুলো-মাটি আর গাছের পাতার পুষ্পবৃষ্টি হল, আর কী একা পেল্লায় জিনিস ধপ-ধপপাস করে নেমে এল গর্তে—প্রায় আমার গা ঘেঁষে। তার প্রকাণ্ড ল্যাজটা চাবুকের মতো আমার গায়ে ঘা মারল।

আর সেই বিরাট জন্তুটা গুরুর্—হুম্—বলে কান-ফাটানো এক চিৎকার ছাড়ল।

সে-চিৎকারে আমার মাথা ঘুরে গেল। চোখের সামনে দেখলুম সারি সারি সর্ষে ফুলের শোভা। উৎকট দুর্গন্ধে যেন দম আটকে আসতে চাইল।

গর্তে যে পড়েছে—তাকে আমি দেখেছি।

সে বাঘ! বাঘ ছাড়া আর কেউ নয়।

আমার তা হলে বারোটা নয়—সাড়ে দেড়টাও নয়, পুরো সাড়ে আড়াইটে বেজে গেল। একবার আমি হাঁ করলুম, খুব সম্ভব গাঁ-গাঁ করে খানিক আওয়াজ বেরুল, তারপর—

তারপর থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে গর্তের মাটিতে একেবারে পপাত।

তে রো

## বাঘ ভার্সাস ঘোগ

খুব সম্ভব মরেই গিয়েছিলুম। কিন্তু মরা মানুষকেও যে জাগিয়ে তুলতে পারে সে হল বাঘের ডাক। কানের পাশে যেন একসঙ্গে পঁচিশটা বাজ পড়ল এইরকম মনে হল আমার, আর মুখের ওপর ফটাস করে মোটা কাছির মতো কিসের একটা ঘা লাগল। বুঝতে পারলুম, বাঘের ল্যাজ।

মাত্র একহাত দূরে আমার বাঘ পড়েছে— তারপরেও কি আমার বেঁচে থাকা সম্ভব? আমি—পটলডাঙার প্যালারাম— এ-যাত্রা নির্ঘাত তা হলে মারাই গেছি। আর যদি মরেই গিয়ে থাকি— তা হলে আর কিসের ভয় আমার? আমি তো এখন ভূত। ভূতকে কি কখনও বাঘে ধরে?

আবার বিশটা বাজের মতো আওয়াজ করে, গর্ত ফাটিয়ে বাঘ হাঁক ছাড়ল— তারপরেই একটা পেল্লায় লাফ। আমি ঝট করে একটু সরে গিয়েছিলুম বলে বাঘ আমার গায়ে পড়ল না, কিন্তু ল্যাজটার ঘায়ে আমার নাক প্রায় থেঁতলে গেল। আর বাঘের নখের আঁচড়ে গর্তের গা থেকে খানিক মাটি ঝুরঝুর করে চোখময় ছড়িয়ে গেল।

এ তো ভালো ল্যাঠা দেখছি! বাঘ যদি আমাকে না-ও ধরে— বাঘের দাপাদাপিতেই আমি— মানে আমার ভূতটা— মারা যাবে। কিংবা নাকে যখন ল্যাজের ঘা এসে এমন বেয়াড়াভাবে লেগেছে যে মনে হচ্ছে হয়তো আমি বেঁচেই আছি।

আবার বাঘের গর্জন ! উঃ, কান দুটো তো ফেটে গেল ! এসপার কি ওসপার !

এবার বাঘ লাফ মারবার আগেই আমি লাফ মারলুম। আর হাতে যা ঠেকল তা গোটাকয়েক গাছের শেকড়।

আমি পটলডাঙার প্যালারাম— জীবনে কোনও দিন একসারসাইজ করিনি— পালাজ্বরে ভুগেছি আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেয়েছি। দু'-একবার খেলতে নেমেছিলুম, কিন্তু কী কাণ্ড যে করেছি— তোমাদের ভেতর যারা প্যালারামের কীর্তি-কাহিনী পড়েছ তারা তা সবই জানো। সব্বাই আমাকে বলে— আমি রোগাপটকা, আমি অপদার্থ। কিন্তু এখন দেখলুম— রোগা-টোগা ও-সব কিছু না— স্রেফ বাজে কথা। মনে জোর এলে আপনি গায়ের জোর এসে যায়— দুনিয়ার কোনও কাজ আর অসম্ভব বলে বোধ হয় না। আমি প্রাণপণে সেই শেকড় ধরে ঝুলতে লাগলুম। তাকিয়ে দেখি আরও শেকড় রয়েছে ওপরে। কাঁচা মাটির গর্তে পা দিয়ে দিয়ে শেকড় টেনে টেনে—

আরে—আরে—আমি যে ওপরে উঠে গেছি প্রায় ! একটু— আর একটু—

নীচের গর্তে তখন যে কী দাপাদাপি চলছে ভাবাই যায় না। বাঘের চিৎকারে বিশটা নয়—পঁচিশটা নয়— একশোটা বাজ যেন ফেটে পড়ছে। বাঘ লাফিয়ে উঠছে থেকে থেকে— একবার একটা থাবা প্রায় আমার পা ছুঁয়ে গেল। শেষ শক্তি দিয়ে আমি সবচেয়ে ওপরের শিকড়টা টেনে ধরলুম, সেটা মটমট করে উঠল, তারপর ছিঁড়ে পড়ার আগেই আমি গর্তের মুখে— আবার শক্ত মাটিতে উঠে পড়লুম।

আর তখন মনে হল, আমার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন ফেটে যাচ্ছে। কাঁধ দুটোকে কে যেন আলাদা করে ছিঁড়ে নিচ্ছে দু'দিকে। কপাল থেকে ঘাম চোখে নেমে এসে সব ঝাপসা করে দিচ্ছে, আগুন ছুটছে সারা গায়ে। ঘাসের ওপর দাঁড়াতে গিয়েও আমি দাঁড়াতে পারলুম না— সত্যিই বেঁচে আছি না মরে গেছি ভালো করে বোঝবার আগেই সব অন্ধকার হয়ে গেল।

তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা পরিষ্কার হতে লাগল। মুখের ওপর কী যেন সুড়সুড় করে হাঁটছে এমনি মনে হল। টোকা দিয়ে সেটাকে ফেলে দিয়ে দেখি, একটা বেশ মোটাসোটা গুবরে পোকা। চিত হয়ে পড়ে বোঁ-বোঁ করে হাত-পা ছুঁড়ছে।

আস্পর্ধা দ্যাখো একবার ! আমার মুখখানাকে বোধহয় গোবরের তাল মনে করেছিল। এখন থাকো চিত হয়ে।

তক্ষুনি আবার যেন পাতাল থেকে কামানের ডাক এল। মাটিটা কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

দেখলুম, আমি মাটিতে পা ছড়িয়ে উবুড় হয়ে পড়ে আছি। আমার মাথার সামনে ঠিক ছ'ইঞ্চি দূরে কুয়োর মতো মস্ত একটা গর্তের মুখ। আমার হাতের মুঠোয় কতগুলো সরু-সরু ছেঁড়া শেকড়।

সব মনে পড়ে গেল। একটু আগেই গর্তটা থেকে আমি উঠে এসেছি। তারপর ভিরমি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম।

কিন্তু গর্তের মধ্যে বাঘ কি এখনও আছে ? নিশ্চয় আছে। নইলে সে উঠে এলে আমি আর মাটিতে থাকতুম না— আরও ভালো জায়গায় আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়ে যেত— মানে বাঘের পেটের ভেতর। আর সেই শজারু ? সে-ও নিশ্চয় যথাস্থানেই রয়েছে— আর দু'জনে মিলে জোর মজারু চলছে গর্তে।

মজা ? বাঘের চিৎকার তো ঠিক সে-রকমটা মনে হচ্ছে না !

আমি চার পায়ে ভর দিয়ে উঠলুম— গলাটা একটু বাড়িয়ে দিলুম গর্তের দিকে। ভেতরে প্রথমটা খালি অন্ধকার মনে হল— আর বোধ হল, বিষম একটা দাপাদাপি চলছে। কিন্তু

তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু একটু করে আমি সব দেখতে পেলুম।

শজারুটা কেমন তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে— তার চারটে পা আর মাথাটা অল্প অল্প নড়ছে। তার পাশেই পড়ে আছে বাঘ— লাফাচ্ছে না, সমানে হাঁপাচ্ছে, আর কী একটা যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে একটানা।

এবারে ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি রইল না।

বাঘ পড়েছিল সোজা শজারুর ওপর। তার ধারালো কাঁটাগুলো বাঘের সর্বাঙ্গে বিঁধেছে শরশয্যার মতো। আর তারই যন্ত্রণায় বাঘ অমনভাবে লাফঝাঁপ করছে— আমি যে শেকড় ধরে ধরে গর্ত বেয়ে ওপরে উঠে এসেছি, সে তা দেখতেও পায়নি। ওই শজারুটা নিজের প্রাণ দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছে।

শজারুটার জন্যে আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। আর কেন জানি না— বাঘের জন্যেও মায়ায় মনটা আমার ভরে উঠল। সর্বাঙ্গে শজারুর কাঁটা বিঁধে না-জানি কত যন্ত্রণাই পাচ্ছে বাঘটা। এর চাইতে যদি একেবারে মরে যেত, তাহলেও ঢের ভাল হত ওর পক্ষে।

একমনে দেখছি— হঠাৎ টপাস্।

কী একটা ঢিলের মতো এসে পড়ল পিঠের ওপর।— আরে—আরে করে উঠে বসলুম—আবার টপাস্। একেবারে চাঁদির ওপর। তাকিয়ে দেখি শুকনো সীমের মতো কী এরকম ফল।

ওপর থেকে আপনি পড়ছে নাকি?

না—না। যেই চোখ তুলে তাকিয়েছি, দেখি গাছের ডালে বসে কে যেন বিশ্রীরকমভাবে ভেংচি কাটছে আমাকে। ইয়া বড় একটা গোদা বাঁদর। এখানে আসা অবধিই দেখছি হাড়বজ্জাত বাঁদরগুলো পেছনে লেগেছে আমাদের। নাকটাকে ছারপোকার মতো করে গাছ থেকে কতগুলো শুকনো ফল ছিঁড়ে ছিঁড়ে সে আমার পিঠ বরাবর তাক করছে, আর সমানে ভেংচি কেটে চলেছে।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, এই!—তারপর বাঁদরটাকে আরও ঘাবড়ে দেবার জন্যে হিন্দী করে বললুম, ফের বদমায়েসী করেগা তো কান ধরকে এক থাপ্পড় মারেগা।

অবশ্য গাছের ওপর উঠে ওর কানটা হাতে পাওয়া মুস্কিল— থাপ্পড় মারা আরও মুস্কিল। কিন্তু যে করে হোক, বাঁদরটাকে নার্ভাস করে দেওয়া দরকার। আমি আবার বললুম, এক চাঁটিমে দাঁত উড়ায় দেগা। কেন ঢিল মারতা হ্যায়? হাম পটলডাঙার প্যালারাম হ্যায়— সমঝা?

বাঁদরটা দাঁত বের করে কী যেন বললে।—কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাঁচাগোল্লা কিংবা অমনি একটা কিছু হবে।

কাঁচাগোল্লা? আমার দারুণ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আচ্ছা— তাই সই। তোমায় কাঁচাগোল্লাই খাওয়াচ্ছি।

সামনেই কয়েকটা শুকনো মাটির ঢেলা পড়ে ছিল। তার দু'-একটা তুলে নিয়ে বললুম, চলা আও—চলা আও—

সঙ্গে সঙ্গে নাকের ওপর আর-একটা ফল এসে পড়ল। বাঘের ল্যাজের ঘা খেয়ে নাকটা এমনিতেই বোঁচা হওয়ার জো— তার ওপর বাঁদরের এই বর্বর অত্যাচার। আমার শরীরে দস্তুরমতো ব্রহ্মতেজ এসে গেল।

চালাও ঢিল— লাগাও—

দমাদ্দম গাছের ওপর ঢিল চালাতে লেগে গেলুম। একেবারে মরিয়া হয়ে।

হঠাৎ বোঁ—ওঁ—ওঁ করে কেমন বেয়াড়া বিচ্ছিরি আওয়াজ।

এরোপ্লেন নাকি ? আরে না-না— এরোপ্লেন কোথায় ? গাছের একটা ডাল থেকে দল বেঁধে উড়ে আসছে ওরা কারা ? চিনতে আমার একটুও কষ্ট হল না— ছেলেবেলায় মধুপুরে ওদের একটার মোক্ষম কামড় আমি খেয়েছিলুম। সেই থেকে ওদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

ভীমরুল ! আমার ঢিল বাঁদরের গায়ে লাগুক আর না-লাগুক—ঠিক ভীমরুলের চাকে গিয়ে লক্ষ্যভেদ করেছে।

—মাঁরুচি—মাঁরুচি—খাউঞ্চি বলে বাঁদরটা এক লাফে কোথায় হাওয়া হল কে জানে ! ওর মধ্যেই দেখতে পেলুম ওর নাকে মুখে ল্যাজে ভীমরুলেরা চেপে বসেছে। বোঝো— আমাকে ভ্যাংচানোর আর ঢিল মারবার মজাটা বোঝো !

কিন্তু এ কী ! আমার দিকেও যে ছুটে আসছে ঝাঁক বেঁধে। এখন ?

দৌড়—দৌড়—মার দৌড় !

তবু সঙ্গ ছাড়ে না যে ! যত ছুটছি, ততই যে পেছনে পেছনে আসছে ঝাঁক বেঁধে ! এল—এল—এই এসে পড়ল— ! গেছি এবার ! কামড়ে আমাকে আর আস্ত রাখবে না !

এখন কী করি ? বাঘের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে শেষে কি ভীমরুলের হাতে মারা যাব ? আমি ঠিক এই সময়েই—

জয় গুরু ! সামনে একটা পচা ডোবা !

ঝপাং করে আমি সেই ডোবাতেই সোজা ঝাঁপ মারলুম।

## চোদ্দো

কী পচা পাঁক, আর কী বিচ্ছিরি গন্ধ ! কতক্ষণ আর মাথা ডুবিয়ে থাকা যায় তার ভেতরে ! একটু মাথা তুলি, আর বোঁ—ওঁ—ওঁ ! সমানে চক্কর দিচ্ছে ভীমরুলেরা। এ কী ল্যাঠায় পড়া গেল !

ভাগ্যিস ডোবাটায় বেশি জল নেই, নইলে তো ডুবে মরতে হত ! হাঁটু-সমান কাদা আর একটুখানি জলের ভেতর কোনওমতে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছি। চারিদিকে ব্যাঙ লাফাচ্ছে— নাকে-কানে পোকা ঢুকছে, ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে। বাঘের গর্ত থেকে উঠে কি শেষতক পচা ডোবার মধ্যেই মারা যাব নাকি ?

একবার মাথা ওঠাই— অমনি বোঁ-ওঁ-ওঁ ! আবার ডুব ! অমনি করে কতক্ষণ কাটল জানি না। তারপর যখন ভীমরুলেরা হতাশ হয়ে সরে পড়ল, তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখে-টেখে আমি ডোবা থেকে উঠে এলুম।

ইঃ—কী খোলতাই চেহারাখানাই হয়েছে। একটু আগে আমি ছিলুম পটলডাঙার প্যালারাম— ওজন ছিল সর্বসাকুল্যে এক মন সাত সের। এখন আমি যে কে— ঠাহরই করতে পারলুম না। সারা গায়ে কাদার আস্তর পড়েছে, নিজের হাত-পা জামা-কাপড় কিছু দেখতে পাচ্ছি না— পা তো ফেলছি না, যেন হাতির মতো পদক্ষেপ করছি ! আমি এখন ওজনে অন্তত সাড়ে তিন মন— মাথার ওপর আরও পোয়াটাক ব্যাঙাচি নাচানাচি করছে।

কিন্তু এমন কী করি ! কোন্ দিকে যাই ?

কাদা-টাদাগুলো খানিক পরিষ্কার করলুম, জামা জুতো ডোবার জলেই ধুয়ে নিলুম। কিন্তু

এখন কোন দিকে যাই ! শীতে সারা শরীর জমে যেতে চাইছে। চারিদিকে ঘন জঙ্গল— কোথায় যাব, কী করব কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। টেনিদার কী হল— চারমূর্তির বাকি তিনজনই বা কোথায়—কুট্টিমামা তাঁর শিকারিদের নিয়েই বা কোন্ দিকে গেলেন ?

সে ভাবনা পরে হবে। এখন এই শীতের হাত থেকে কেমন করে রেহাই পাই ?

বনের পাতার ফাঁক দিয়ে এক জায়গায় ঝলমলে রোদ পড়েছে খানিকটা। বেলা এখন বোধহয় দুপুরের দিকে। আমি সেই রোদের মধ্যে এসে দাঁড়ালুম। বেশ ঝাঁঝালো রোদ— এতক্ষণে একটু আরাম পাচ্ছি।

কিন্তু ল্যাঠা কি আর একটা নাকি ? এইবারে টের পেলুম— পেটের মধ্যে চুঁই চুঁই করে উঠেছে। মানে—জোর খিদে পেয়েছে।

যেই খিদেটা টের পেলুম অমনি মনে হল আমি যেন কতকাল খাইনি—নাড়িভুঁড়িগুলো সব আবার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চাইছে। খিদের চোটে আর দাঁড়াতে পারছি না আমি। মনে পড়ল, আসবার সময় টিফিন-ক্যারিয়ার-ভর্তি খাবার আনা হয়েছিল—তাতে লুচি ছিল, আলুর দম ছিল, বেগুন ভাজা ছিল, সন্দেশ ছিল—

হায়, কোথায় ভ্যান— কোথায় লুচি আর আলুর দম। জীবনে কোনও দিন কি আর আলুর দমের মুখ দেখতে পাব আমি। কিছুক্ষণ পরে বনের ভেতরই পটলডাঙার প্যালারামের বারোটা বেজে যাবে। যদি বাঘ-ভালুকে না খায়, খিদেতেই মারা যাব।

নাঃ, আর পারা যায় না। কিছু একটা খাবার-দাবার জোগাড় করা দরকার।

যেই খাবার-দাবারের কথা ভাবলুম— অমনি শরীরে তেজ এসে গেল। আমি দেখেছি, আমার এই রকমই হয়। সেই একবার হাবুলের ছোট ভাই বাবুলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন ছিল। আগের দিন রাতে কোঁ-কোঁ করে জ্বর এসে গেল। ভাবলুম, পরদিন ওরা সবাই প্রেমসে মাংস-পোলাও সাঁটবে আর আমার বরাতে কেবল বার্লির জল। দারুণ মনের জোর নিয়ে এলুম। বললে বিশ্বাস করবে না, সকালেই জ্বর একদম রেমিশন। খেয়েছিলুমও ঠেসে। অবশ্য সেদিন রাত থেকে...কিন্তু সে-কথা বলে আর কাজ নেই। মানে, নেমন্তন্নটা তো আর ফসকাতে দিইনি।

আপাতত আমায় খেতেই হবে। শীত-ফীত চুলোয় যাক।

বনে তো অনেক রকম ফল-পাকড় থাকে শুনেছি। মুনি-ঋষিরা সেইসব খেয়েই তপস্যা করেন। আমি গাছের দিকে তাকাতে তাকাতে গুটি-গুটি এগোলুম। দুৎ— ফল কোথায় ? কেবল পাতা আর পাতা। ছাগল হলে অবিশ্যি ভাবনা ছিল না। বড়দা আমাকে ছাগল বলে বটে, কিন্তু আমি তো সত্যিই-সত্যিই ঘাস-পাতা খেতে পারি না। ফল পাই কোথায়।

একটা গাছের তলায় কালো কালো ক'টা কী যেন পড়ে রয়েছে। একটা তুলে কামড় দিয়ে দেখি— বাপরে। ইটের চাইতেও শক্ত— দাঁত বসবে না। একটু দূরেই লাল টুকটুকে গোটা-দুই ফল লতা থেকে ঝুলছিল—দৌড়ে গিয়ে একটা ছিঁড়ে নিলুম। কামড় দিতেই— আরে রামো-রামো। কী বিচ্ছিরি ভেতরটাতে, আর কী দারুণ বদ গন্ধ। থু-থু করে ফেলে দিতে পথ পাই না। তখন মনে পড়ল— আরে, এ তো মাকাল। এ তো আমি দেখেছি আগেই। ছ্যা। ছ্যা।

মুনি-ঋষিদের নিকুচি করেছে। বনে ফল থাকে, না ঘোড়ার ডিম থাকে। এখন বুঝতে পাচ্ছি সব গুলপট্টি। আমাকে লাখ টাকা দিলেও আমি কখনও সাধু-সন্নিসি হব না— প্রাণ গেলেও না।

কিন্তু খাই কী।

—ক্র্যাং।

পেছনে কেমন একটা বিটকেল আওয়াজ। আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম।

আবার সেই শব্দ : ক্র্যাং ! ক্র্যাং !

এ আবার কী রে বাবা ! কোথাও কিছু দেখছি না— অথচ থেকে থেকে অমন যাচ্ছেতাই আওয়াজ করছে কে !

—ক্র্যাং—কর্‌-র্‌-র্‌—

একটা দৌড় মারব কি না ভাবছি—এমন সময়— হুঁ হুঁ ! ঠিক আবিষ্কার করেছি ! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি !

দেখি না, পাশেই একটা নালা। তার ভিতরে গোলগাল একটি ভদ্রলোক। ওই আওয়াজ তিনিই করছেন।

ভদ্রলোক ? আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ— ভদ্রলোক ছাড়া কী বলা যায় আর ? একটি নধর নিটোল কোলা ব্যাঙ। পিঠের ওপর বড় বড় টোপ তোলা— মস্ত মস্ত চোখ দুটো কানের মতো খাড়া হয়ে রয়েছে। আমার দিকে ড্যাবডেবে চোখ তুলে চেয়ে রয়েছে, আর থেকে থেকে শব্দ করছে ; ক্রাং-ক্রাং—কর্‌-র্‌ কুর্‌-র্‌—

করছে কী জানো ? ফুটবলের ব্লাডারে হাওয়া দিলে যেমন করে ফোলে, তেমনিভাবে গলার দু'পাশে বাতাস ভরে নিচ্ছে, গলাটা মোটা হয়ে উঠছে। আর বাতাসটা যেমনি ছেড়ে দিচ্ছে অমনি শব্দ হচ্ছে ; ক্র্যাং—কড়াং—

বটে ! তাহলে এমনি করেই কোলা-ব্যাঙ ডাকে ! সারা বর্ষা এইভাবে গ্যাঙর-গ্যাঙর করে !

আমি ব্যাঙটাকে বললুম, খুব যে মেজাজে বসে আছিস দেখছি !

ব্যাঙ একটা মস্ত লাল জিভ বের করে দেখালে।

—আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস বুঝি ?

ব্যাঙ গলার দু'ধারে বাতাস জড়ো করতে লাগল।

—এক চাঁটিতে তোকে উড়িয়ে দিতে পারি তা জানিস ?

ব্যাঙটা আওয়াজ করলে ; ক্র্যাং—কুর্‌র্‌ ! মানে যেন বলতে চাইল ; ইস, ইয়ার্কি নাকি ? চেষ্টা করেই দেখ না একবার।

—বটে !

—ক্রুং—ফুর্‌র্‌—

—জানিস, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে ? আমি ইচ্ছে করলে তোকে এক্ষুনি ভেজে খেতে পারি ?

—তবে তাই খা— বলেই কে আমার পিঠে ঠাস্‌ করে একটা চাঁটি মারল।

—বাপরে— ভূত নাকি ?

আমি হাত-তিনেক লাফিয়ে উঠলুম। তারপর দেখি, একমুখ দাঁত বের করে হাবুল সেন।

—হাবলা—তুই ?

হাবুল বললে, হ, আমি। কিন্তু তোর এ কী দশা হইছে প্যালা ? কাদা মাইখ্যা, ভূত সাইজ্যা অ্যাক্‌টা ব্যাঙের লগে মস্করা করতে আছস ?

এই ফাঁকে ব্যাঙটা মস্ত লাফ দিয়ে ঝোপের মধ্যে কোথায় যেন চলে গেল।

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, খোশ-গল্প এখন থাক। কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারিস ?

—আরে আমি খাবার পামু কই ? সেই তখন থিক্যা জঙ্গলের মইধ্যে হারা উদ্দেশ্যে ঘুরতাছি। কে যে কোথায় চইলা গেল খুঁইজ্যাই পাই না। শ্যাষে একটা গাছের নীচে শুইয়া ঘুম দিলাম।

—বনের মধ্যে ঘুমুলি ?

—হ্, ঘুমাইলাম।
—তোকে যদি বাঘে নিত ?
হাবুল আবার একগাল হাসল ; আমারে বাঘে খায় না।
—কী করে জানলি ?
—আমি হাবুল স্যান না ? উইঠ্যা বাঘেরে অ্যামন অ্যাক্টা চোপাড় দিমু যে—
বাকিটা হাবুল আর বলতে পারল না। হঠাৎ সমস্ত বন জঙ্গল কাঁপিয়ে কে যেন বিকট গলায় হ্যা-হ্যাঁ-হ্যাঁঃ করে হেসে উঠল। একেবারে আমাদের কানের কাছেই।
—ওরে বাপরে—
হাবুল আর ডাইনে বাঁয়ে তাকাল না। উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল।
আবার সেই শব্দ ; হ্যা-হ্যা-হ্যাঃ—
এবার সেই ভিজে কাপড়ে জামায় আমিও হাবুলের পেছন দে ছুট— দে ছুট।
—ওরে হাবলা, দাঁড়া-দাঁড়া যাসনি— আমাকে ফেলে যাসনি—

## পনেরো

বেশি দূর দৌড়তে হল না। হাউ-মাউ করে খানিকটা ছুটেই একটা গাছের শেকড়ে পা লেগে হাবুল ধপাস্! সঙ্গে সঙ্গে আমিও তার পিঠের ওপর কুমড়োর মতো গড়িয়ে পড়লুম।
খাইছে— খাইছে!—হাবলা হাহাকার করে উঠল।
তারপর দু'জনে মিলে জড়াজড়ি। ভাবছি পেছন থেকে এবার সেই অট্টহাসির ভূতটা এসে আমাদের দু'জনকে বুঝি ক্যাঁক করে গিলে ফেলল।
কিন্তু মিনিট পাঁচেক গড়াগড়ি করেও যখন কিছুই হল না— আর মনে হল আমরা তো এখন কলেজে পড়ছি— ছেলেমানুষ আর নই, অমনি তড়াক করে উঠে পড়েছি। দুত্তোর ভূত! বাঘের গর্তে পড়েই উঠে এলুম— ভূতকে কিসের ভয়!
হাবুল সেন তো বিধ্বস্তভাবে পড়ে আছে, আর চোখ বুজে সমানে 'রাম রাম' বলছে। বোধহয় ভাবছে ভূত ওর ঘাড়ের ওপর এসে চেপে বসেছে। থাক পড়ে। আমি উঠে জ্বল-জ্বল চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।
অমনি আবার সেই হাসির আওয়াজ ; হ্যাঁঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ!
শুনেই আমি চিংড়িমাছের মতো তিড়িং করে লাফ মেরেছি। হাবুল আবার বললে, খাইছে— খাইছে!
কিন্তু কথাটা হল, হাসছে কে! আর আমাদের মতো অখাদ্য জীবকে খেতেই বা চাচ্ছে কে!
আরে ছ্যা ছ্যা! মিথ্যেই দৌড় করালে! কাণ্ডটা দেখেছ একবার! ওই তো বকের মতো একটা পাখি, তার চাইতে গলাটা একটু লম্বা, কদমছাঁট চুলের মতো কেমন একটা মাথা কালচে রং, কুতকুতে চোখ। আবার দুটো বড়-বড় ঠোঁট ফাঁক করে ডেকে উঠল : হ্যঃ—হ্যাঃ—
—ওরে হাবলা, উঠে পড়! একটা পাখি!
হাবুল সেন কি সহজে ওঠে ? ঠিক একটা জগদ্দল পাথরের মতো পড়ে আছে। চোখ বুজে, তিনটে কুইনাইন একসঙ্গে খাচ্ছে এইরকম ব্যাজার মুখ করে বললে, রাম-নাম কর

প্যালা— রাম-নাম কর ! এইদিকে ভূতে ফ্যাকর ফ্যাকর কইর‍্যা হাসতাছে আর অর অখন পাখি দেখনের শখ হইল !

কী জ্বালা ! আমি কটাং করে হাবুলের কানে একটা চিমটি কেটে দিলুম। হাবুল চ্যাঁ করে উঠল। আমি বললুম, আরে হতচ্ছাড়া, একবার উঠেই দ্যাখ্ না ! ভূত-টুত কোথাও নেই— একটা লম্বা-গলার পাখি অমনি আওয়াজ করে হাসছে।

—কী, পাখিতে ডাকতাছে !— বলেই বীরের মতো লাফিয়ে উঠল হাবুল। আর তক্ষুনি সেই বিচ্ছিরি চেহারার পাখিটা হাবুলের দিকে তাকিয়ে, গলাটা একটু বাঁকিয়ে, চোখ পিটপিট করে, ঠিক ভেংচি কাটার ভঙ্গিতে হ্যা-হ্যা করে ডেকে উঠল।

হাবুল বললে, অ্যাঁ—মস্করা করতে আছস আমাগো সঙ্গে ? আরে আমার রসিক পাখি রে ! অখনি তবে ধইর‍্যা রোস্ট বানাইয়া খামু।

আমার পেটের ভেতরে সেই খিদেটা আবার তিং পাং তিং পাং করে লাফিয়ে উঠল। আমি বললুম, রোস্ট বানাবি ? তবে এক্ষুনি বানিয়ে ফ্যাল না ভাই ! সত্যি বলছি, দারুণ খিদে পেয়েছে !

কিন্তু কোথায় রোস্ট— কোথায় কী ! হাবলাটা এক নম্বরের জোচ্চোর ! তখুনি দু'-তিনটে মাটির চাঙড় তুলে নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে পাখিটার দিকে। আর পাখিটা অমনি ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজ করে পাখা ঝাপটে বনের মধ্যে ভ্যানিশ।

—গেল-গেল—রোস্ট পালিয়ে গেল— বলে আমি পাখিটাকে ধরতে গেলুম। কিন্তু ও কি আর ধরা যায় !

ভীষণ ব্যাজার হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। পাখিদের ওই এক দোষ। হয় দুটো ঠ্যাং থাকে— সেই ঠ্যাং ফেলে পাঁই-পাঁই করে পালিয়ে যায়, নয় দুটো ডানা থাকে— সাঁই-সাঁই করে উড়ে যায়। মানে, দেখতে পেলেই ওদের রোস্ট করা যায় না ! খুব খারাপ—পাখিদের এ-সব ভারি অন্যায় !

আমি বললুম, এখন কী করা যায় হাবুল ?

হাবুল যেন আকাশজোড়া হাঁ করে হাই তুলল। বললে, কিছুই করন যায় না— বইস্যা থাক।

—কোথায় বসে থাকব ?

—যেখানে খুশি। এইটা তো আর কইলকাতার রাস্তা না যে ঘাড়ের উপর অ্যাকটা মটরগাড়ি আইস্যা পোড়ব।

—কিন্তু বাঘ তো এসে পড়তে পারে !

—আসুক না। —বেশ জুত করে বসে পড়ে হাবলা আর-একটা হাই তুলল ; বাঘে আমারে খাইব না। তোরে ধইরা খাইতে পারে। কিন্তু তোরে খাইয়া বাঘটা নিজেই ফ্যাচাঙে পইড়্যা যাইব গা। বাঘের পেটের মধ্যে পালাজ্বরের পিলা হইব। —বলেই মুখ-ভর্তি শাঁকালুর মতো দাঁত বের করে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল।

ভিজে ভূত হয়ে আছি— সারা গা-ভর্তি এখনও পাঁক। ওদিকে পেটের ভিতর খিদেটা সমানে তেরে-কেটে-তাক বাজাচ্ছে। এদিকে এই হনোলুলু— না মাদাগাস্কার— না-না সুন্দরবন—দুত্তোর, ভুয়ার্সের এই যাচ্ছেতাই জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে রয়েছি। তার ওপর একটু পরেই রাত নামবে— তখন হাতি, গণ্ডার, বাঘ, ভালুক সবাই মোকাবিলা করতে আসবে আমাদের সঙ্গে। এখন এইসব ফাজলামি ভালো লাগে ? ইচ্ছে হল, হাবলার কান পেঁচিয়ে একটা পেল্লায় থাপ্পড় লাগিয়ে দিই।

কিন্তু হাবলাটা আবার বক্সিং শিখেছে। ওকে ঘাঁটিয়ে সুবিধে করতে পারব না। কাজেই

মনের রাগ মনেই মেরে জিজ্ঞেস করলুম, তোকে বাঘে খাবে না কী করে জানলি ?

হাবুল গম্ভীর হয়ে বললে, আমার কুষ্ঠীতে লেখা আছে ব্যাঘ্রে আমারে ভোজন করব না।

আমি রেগে বললুম, দুত্তোর কুষ্ঠীর নিকুচি করেছে! আমাদের পাড়ার যাদবদার কুষ্ঠীতে তো লেখা ছিল সে অতি উচ্চাসনে আরোহণ করবে। এখন যাদবদা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দশতলার ঘরগুলো ঝাঁট দেয়।

হাবুল বললে তা উচ্চাসনই তো হইল।

আমি ভেংচে বললুম, তা তো হইল। কিন্তু ব্যাঘ্রে না-হয় ভোজন করবে না— ভালুক এসে যদি ভক্ষণ করে কিংবা হাতি এসে পায়ের তলায় চেপটে দেয়, তখন কী করবি ?

এইবার হাবুল গম্ভীর হল।

—হ, এই কথাটা চিন্তা করন দরকার। ক্যাপ্টেন টেনিদা হাতির পিঠে উইঠ্যা কোথায় যে গেল— সব গোলমাল কইর‍্যা দিছে। অ্যাক্‌টা বুদ্ধি দে প্যালা। কোন্ দিকে যাওয়া যায়—ক দেখি ?

—যাওয়ার কথা পরে হবে! সত্যি বলছি হাবুল, এখুনি কিছু খেতে না পেলে আমি বাঁচব না। কী খাওয়া যায় বল তো ?

—হাতি-ফাতি ধইর‍্যা খা— আর কী খাবি ?

ওর সঙ্গে কথা কওয়াই ধাষ্টামো। এদিকে এত ভূতের ভয়— ওদিকে দিব্যি আবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। যেন নিজের মোলায়েম বিছানাটিতে নবাবি কেতায় গা এলিয়ে দিয়েছে। একটু পরেই হয়তো ঘুর-ঘুর করে খাসা নাক ডাকাতে শুরু করবে। ও-হতচ্ছাড়াকে বিশ্বাস নেই— ও সব পারে।

কিন্তু আমায় কিছু খেতেই হবে। আমি খাবই।

চারদিকে ঘুর-ঘুর করছি। নাঃ—কোথাও একটা ফল নেই— খালি পাতা আর পাতা! বনে নাকি হরেক রকমের ফল থাকে আর মুনি-ঋষিরা তাই তরিবত করে খান। স্রেফ গুলপট্টি!

এমন সময় : ক্যাঁক-ক্যাঁক—কোঁর্-র্—

যেই একটা ঝোপের কাছাকাছি গেছি, অমনি একজোড়া বন-মুরগি বেরিয়ে ভোঁ-দৌড়! আমার আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল! ইস্—পাখিদের কেন ঠ্যাং থাকে ? বিশেষ করে মুরগিদের ? কেন ওরা কারি কিংবা রোস্ট হয়ে জন্মায় না ?

কিন্তু জয় গুরু! ঝোপের মধ্যে চারটে সাদা রঙের ও কী ? অ্যাঁ— ডিম! মুরগির ডিম!

খপ্ করে দু'হাতে দুটো করে ডিম তুলে নিলুম। হাবুলের দিকে তাকিয়ে দেখি ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক হতভাগা! ওকে আর ভাগ দিচ্ছি না! এ চারটে ডিম আমিই খাব। কাঁচাই খাব।

একটা ভেঙে যেই মুখে দিয়েছি— ব্যস! আমার চোয়াল সেইখানেই আটকে গেল! আমার সামনে কোত্থেকে এসে দাঁড়িয়েছে এক বিকট কালো মূর্তি—ঝোপের ভেতর মনে হল নির্ঘাত একটা মস্ত ভালুক!

এমনিতে গেছি— অমনিতেও গেছি! আমি একটা বিকট চিৎকার করে ডাকলুম : হাবুল! তারপর হাতের একটা ডিম সোজা ছুড়ে দিলুম ভালুকটার দিকে।

আর ভালুক তক্ষুনি ডিমটা লুফে নিয়ে স্পষ্ট মানুষের গলায় বললে, দে না! আর আছে ?

ষো লো

# শেষ পর্যন্ত কুট্টিমামা

ভালুকে বাংলা বলে ! এমন পরিষ্কার ভাষায় !

আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হতে যাচ্ছিল, কিন্তু জলে-কাদায় মাখামাখি বলে খাড়া হতে পারল না। তার বদলে সারা গায়ে যেন পিঁপড়ে সুড়-সুড় করতে লাগল, কানের ভেতর কুটুং কুটুং করে আওয়াজ হতে লাগল। অজ্ঞান হব নাকি ? উঁহু— কিছুতেই না। বারে বারে অজ্ঞান হওয়ার কোনও মানে হয় না—ভারি বিচ্ছিরি লাগে !

ঠিক এই সময় পেছন থেকে হাবুল বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল : পলা—পলাইয়া আয় প্যালা— তরে ভাল্লুকে খাইব !

'ভাল্লুকে খাইব' শুনেই আমি উল্লুকের মতো একটা লাফ দিয়েছি। আর ভালুকটা অমনি করেছে কী— তার চাইতেও জোরে লাফ দিয়ে এসে ক্যাঁক করে আমার ঘাড়টা চেপে ধরেছে।

আমি কাঁউ কাঁউ করে বললুম, গেছি— গেছি—

আর ভালুক ভেংচি কেটে বললে, গেছি— গেছি ! যাবি আর কোথায় ? কথা নেই, বার্তা নেই— গেলেই হল !

আরে রামঃ— এ যে ক্যাবলা ! একটা ধুমসো কম্বল গায়ে !

—ক্যাবলা—তুই !

—আমি ছাড়া আর কে ? পটলডাঙার শ্রীমান্ ক্যাবলা মিত্তির— অর্থাৎ শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মিত্র। দাঁড়া— সব বলছি। তার আগে ডিমটা খেয়ে নিই— বলে ডিমটা ভেঙে পট করে মুখে ঢেলে দিলে।

কী যে ভীষণ রাগ হল সে আর কী বলব ! ভালুক সেজে ঠাট্টা— তার ওপর আবার এত কষ্টের ডিম বেশ আমেজ করে খেয়ে নেওয়া ! তাকিয়ে দেখি আমার হাতে একটাও ডিম নেই— সব মাটিতে পড়ে একেবারে গুঁড়ো। সেই যে লাফটা মেরেছিলুম—তাতেই ওগুলোর বারোটা বেজে গেছে।

এদিকে মজাসে ডিমটা খেয়ে ক্যাবলা গান জুড়ে দিয়েছে ; হাম্‌টি ডাম্‌টি স্যাট্ অন্ এ ওয়াল—

আমি ক্যাবলার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলুম। বললুম, রাখ তোর হাম্‌টি-ডাম্‌টি ! কোন্ চুলোয় ছিলি সারাদিন ? একটা মোটা ধুমসো কম্বল গায়ে চড়িয়ে এসে এসব ফাজলামো করবারই বা মানে কী ?

ক্যাবলা বললে, আরে বলছি, বলছি— হড়বড়াতা কেঁউ ? লেকিন হাবুল কিধর ভাগা ?

তাই তো— হাবুল সেন কোথায় গেল ? এই তো গাছতলায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিল। তারপর আমাকে ডেকে বললে, পালা— পালা ! কিন্তু পালিয়েছে দেখছি নিজেই। কোথায় পালাল ?

দু'জনে মিলে চেঁচিয়ে ডাক ছাড়লুম : ওরে হাবলা রে— ওরে হাবুল সেন রে—

হঠাৎ ওপর থেকে আওয়াজ এল : এই যে আমি এইখানে উঠেছি—

তাকিয়ে দেখি, ন্যাড়া-মুড়ো কেমন একটা গাছের ডালে উঠে হাবুল ঘুঘুর মতো বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, উঠেছিস, বেশ করেছিস। নেমে আয় এখন। উতারো।

—নামতে তো পারতাছি না। তখন বেশ তড়াং কইর‍্যা তো উইঠ্যা বসলাম। অখন দেখি লামন যায় না। কী ফ্যাচাঙে পইর‍্যা গেছি ক দেখি ? এইদিকে আবার লাসায় কামড়াইয়া গা ছুইল্যা দিতে আছে !

আমি বললুম, লাসায় কামড়ে তোকে তিব্বতে পাঠাচ্ছে !

হাবুল খ্যাঁচখেঁচিয়ে বললে, ফালাইয়া রাখ তর মস্করা। অখন লামি ক্যামন কইর‍্যা ? বড় ল্যাঠায় পড়ছি তো !

ক্যাবলা বললে, লাফ দে।

—ঠ্যাং ভাঙব !

—তা হলে ডাল ধরে ঝুলে পড়। আমরা তোর পা ধরে টানি।

—ফালাইয়া দিবি না তো চালকুমড়ার মতন ?

—আরে না—না !

—তাই করি। অখন যা থাকে কপালে—

বলেই হাবুল ডাল ধরে নীচে ঝুলে পড়ল। আমি আর ক্যাবলা তক্ষুনি ওপরে লাফিয়ে উঠে হাবুলের দু'পা ধরে হেঁইয়ো বলে এক হ্যাঁচকা টান।

—সারছে—সারছে—কম্মো সারছে— বলতে বলতে হাবুল আমাদের ঘাড়ে পড়ল। তারপরে তিনজনেই একসঙ্গে গড়িয়ে গেলুম। আমার নাকটায় বেশ লাগল— কিন্তু কী আর করা— বন্ধুর জন্যে সকলকেই এক-আধটু কষ্ট সইতে হয়।

উঠে হাত-পা ঝেড়ে তিনজনে গোল হয়ে বসলুম। আমার গল্প শুনে ক্যাবলা তো হেসেই অস্থির।

—খুব যে হাসছিস ? যদি বাঘের গর্তে গিয়ে পড়তিস, টের পেতিস তা হলে।

—বাঘের পাল্লায় আমিও পড়িনি বলতে চাস ?

—তুইও ?

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, পড়বই তো। ব্যাবাকে পড়ব। ক্যাবল আমি না। আমার কুষ্ঠীতে লেখা আছে ; ব্যাঘ্রে আমারে কক্ষনো ভোজন করব না।

আমি ধমকে বললুম, চুপ কর হাবলা— তোর কুষ্ঠীর গল্প বন্ধ কর। তোর কী হয়েছিল রে ক্যাবলা ?

—হবে আবার কী। হাতির পায়ের দাগ ধরে ধরে আমি তো এগোচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ কানে এল ধুড়ুম করে এক বন্দুকের আওয়াজ।

—হ, আওয়াজটা আমিও পাইছিলাম— হাবুল জানিয়ে দিলে।

—অঃ, থাম না হাবলা। বলে যা ক্যাবলা—

ক্যাবলা বলে চলল,—তারপরেই দেখি বনের মধ্যে দিয়ে একটা বাঘ পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে আসছে। দেখে আমার চোখ একেবারে চড়াং করে চাঁদিতে উঠে গেল। আমিও বাপ-বাপ করে দৌড়— একেবারে মোটরটার কাছে চলে গেলুম। তারপর মোটরের কাচ-টাচ বন্ধ করে চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইলুম।

—সেই বাঘটাই বোধহয় আমার গর্তে গিয়ে পড়েছিল— আমি বললুম।

—হতে পারে, ক্যাবলা বললে ; খুব সম্ভব সেটাই। যাই হোক, আমি তো মোটরের মধ্যে বসে আছি। ঘণ্টা-দুই পরে নেমে টেনিদার খোঁজে বেরুব— এমন সময়, ওরে বাবা !

—কী—কী ?—আমি আর হাবুল সেন একসঙ্গে জানতে চাইলুম।

—কী আর ?—ভীমরুলের চাক। একেবারে বোঁ-বোঁ করে ছুটে আসছে।

আমি বললুম, হুঁ—আমার ঢিল খেয়ে।

ক্যাবলা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, উ তো ম্যয় সমঝ লিয়া ! তোর মতো গর্দভ ছাড়া এমন ভালো কাজ আর কে করবে ! দৌড়ে আবার গিয়ে মোটরে উঠলুম। ঠায় বসে থাকো আর-এক ঘণ্টা ! তারপর দেখি, ড্রাইভারের সিটের পাশে কম্বল রয়েছে একটা। বুদ্ধি করে সেটা গায়ে জড়িয়ে নেমে এলুম— ভীমরুল যদি ফের তেড়ে আসে, তা হলে কাজে লাগবে। অনেকক্ষণ এদিকে ওদিকে খুঁজে শেষে আবিষ্কার করলুম, শ্রীমান প্যালারাম বনমুরগির ডিম হাতাচ্ছেন। তারপর—

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, তারপর আর বলতে হবে না— সব জানি। তুই তো তবু একটা ডিম খেলি— আর আমার হাত থেকে পড়ে সবগুলো গেল ! ইস— এমন খিদে পেয়েছে যে এখন তোকে ধরে আমার কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে !

ক্যাবলা বললে, এই খবর্দার, কামড়াসনি। আমার জলাতঙ্ক হবে !

—জলাতঙ্ক হবে মানে ? আমি কি খ্যাপা কুকুর নাকি ?

হাবুল বললে, —কইব কেডা ?

আমি হাবুলকে চড় মাতে যাচ্ছিলুম, ক্যাবলা বাধা দিলে। বললে, বন্ধুগণ, এখন আত্মকলহের সময় নয়। মনে রেখো, আমাদের লিডার টেনিদা হাতির পিঠে চড়ে উধাও হয়েছে। তাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

—সে কি আর আছে ? হাতিতে তারে মাইর‍্যা ফ্যালাইছে।— বলেই হাবলা হঠাৎ কেঁদে ফেলল ; ওরে টেনিদা রে— তুমি মইর‍্যা গেলা নাকি রে ?

শুনেই আমারও বুকের ভেতর গুরগুর করে উঠল। আমিও আর কান্না চাপতে পারলুম না।

—টেনিদা, ও টেনিদা—তুমি কোথায় গেলে গো—

এমন যে শক্ত, বেপরোয়া ক্যাবলা— তারও নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস করে গোটাকয়েক আওয়াজ বেরুল। তারপর আরশোলার মতো খুব করুণ মুখ করে সেও ডুকরে কেঁদে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বললে, আরে— আরে— এই তো তিনজন বসে আছে !

চমকে তাকিয়ে দেখি, কুট্টিমামা, শিকারি আর বাহাদুর।

আমরা আর থাকতে পারলুম না। তিনজনে একসঙ্গে হাহাকার করে উঠলুম : কুট্টিমামা গো, টেনিদা আর নেই।

কুট্টিমামার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—সে কি ! কী হয়েছে তার ?

হাবুল তারস্বরে ডুকরে উঠে বলল, তারে বুনা হাতিতে নিয়া গেছে কুট্টিমামা— তারে নিয়া গিয়া অ্যাকেবারে মাইর‍্যা ফ্যালাইছে।

কুট্টিমামার হাত থেকে বন্দুকটা ধপাৎ করে মাটিতে পড়ে গেল।

সতেরো

## হাতি থেকে কাটলেট

একটু সামলে-টামলে নিয়ে কুট্টিমামা বললেন, বুনো হাতিতে নিয়ে গেল!

আমরা সবাই কোরাসে গলা তুলে বললুম, হুঁ!

তাই শুনে কুট্টিমামা মাথার চাঁদির ওপর টাকটাকে কিছুক্ষণ কুর-কুর করে চুলকোলেন। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন, মানে, তা কী করে হয়? হাতিতে নেবে কেমন করে?

হাবুল বললে, হ, নিয়া গেল। হাতি আসতাছে দেইখ্যা আমরা গাছে উঠছিলাম। টেনিদা না— ডাল ভাইঙা একটা হাতির পিঠে গিয়া পড়ল। আর হাতিটাও গাছের পাতা চাবাইতে চাবাইতে তারে কোনখানে য্যান নিয়া গেল।

—তারপর?

ক্যাবলা বললে, আমরা তিনজনে তাকে খুঁজতে বেরুলুম। আমি একটা বন্দুকের আওয়াজ পেলুম। তারপর দেখি একটা বাঘ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে। আমি একেবারে এক লাফে গিয়ে মোটরে!

শিকারি বললে, হুঁ, সেই বাঘটা— যেটাকে আমরা গুলি করেছিলুম। পায়েও চোট লেগেছিল।

কুট্টিমামা বললেন, তারপর?

হাবুল বললে, মনের দুঃখে এক বৃক্ষতলে শয়ন কইর‍্যা আমি ঘুমাইয়া পড়লাম। আমার ভাবনা কী— কুষ্ঠীতে লেখা আছে ব্যাঘ্রে নি আমারে কক্ষনো ভক্ষণ করব না। উইঠ্যা দেখি প্যালা সারা গায়ে কাদা মাইখ্যা ভূত সাইজ্যা একটা মস্ত কোলা ব্যাঙ ধইর‍্যা খাইতাছে।

কুট্টিমামা বললেন, কী সর্বনাশ! কোলা ব্যাঙ ধরে খাচ্ছে।

হাবুল সেনটা কী মিথ্যুক দেখেছ! আমি ভয়ঙ্কর আপত্তি করে বললুম, না মামা—আমি কোলা ব্যাঙ ধরে খাইনি। ওই হাবলাই তো পাখির ডাক শুনে দৌড়ে পালাল। আমি একটা গর্তের ভেতর পড়েছিলুম— আর বাঘটা গিয়ে সেই গর্তেই একটা শজারুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

মামা বললেন, অ্যাঁ! তবে কুলিরা যে গর্ত কেটেছে, বাঘটা তাতেই পড়েছে নাকি? কিন্তু প্যালারাম— তুমি উঠে এলে কী করে?

—স্রেফ ইচ্ছাশক্তির জোরে, কুট্টিমামা! নইলে বাঘটা যেভাবে দাপাদাপি করছিল, তাতে ওর ল্যাজের চোট খেয়েই আমার প্রাণটা বেরিয়ে যেত— থাবার ঘা খাওয়ার দরকার হত না।

কিছুক্ষণ কুট্টিমামা আমার মুখের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর আবার কুরকুরিয়ে টাকটাকে চুলকে নিয়ে বললেন, বাঘটা তা হলে সেই গর্তের মধ্যেই আছে বলছ?

—নির্ঘাত!

—যাক, বাঘের জন্যে তবে ভাবনা নেই। কাল তুলব বাছাধনকে। কিন্তু টেনি—

বলতেই আবার হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল হাবুল: তারে হাতিতেই মাইর‍্যা ফেলছে কুট্টিমামা—এতক্ষণে হালুয়া বানাইয়া রাখছে!

শুনে আমিও ফোঁসফোঁস করে কাঁদতে লাগলুম, আর ক্যাবলা নাক-টাক কুঁচকে কেমন একটা কুঁ—কুঁ আওয়াজ করতে লাগল।

শিকারি মামার কানে-কানে কী বললে। মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে। নইলে এখানে বুনো হাতি কেমন করে আসবে ! তা ছাড়া হাতি তো বটেই। যদি ভয়-টয় পেয়ে—

শিকারি মাথা নেড়ে বললে, তা ঠিক।

তখন কুট্টিমামা আমাদের দিকে তাকালেন। ডেকে বললেন, শোনো, এখন আর কান্নাকাটি করে লাভ নেই। চলো সব গাড়িতে। তোমাদের লিডারকে খুঁজতে যেতে হবে।

হাবুল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, তারে কি আর পাওন যাইব ?

কুট্টিমামা বললেন, একটা জায়গা আগে দেখে আসি। সেখানে যদি হদিস না পাই, তাহলে বনের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতে হবে। চলো এখন গাড়িতে—কুইক।

গাড়িটা দূরে ছিল না। আমরা উঠে বসতে না বসতেই ড্রাইভার স্টার্ট দিলে। মামা তাকে কী একটা জায়গায় যেতে বলে দিলেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বনের ভেতর তখন অল্প-অল্প করে সন্ধ্যা নামছে। হেডলাইটের আলো জ্বেলে গাড়ি ছুটল।

হাবুল ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, এই প্যালা, আমরা কোথায় যাইতাছি ক' দেখি ?

বিরক্ত হয়ে বললুম, কুট্টিমামাকে জিজ্ঞেস কর, আমাকে কেন ?

—না, খুব ক্ষুধা পাইছে কিনা। গাড়িতে টিফিন ক্যারিয়ার-ভর্তি খাবার তো উঠেছিল ! সেইগুলি গেল কোথায় ?

ঠিক আমার মনের কথা বলে দিয়েছে ! এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলুম, এইবার টের পেলুম, পেটের ভেতর তিরিশটা ছুঁচো যেন একসঙ্গে হা-ডু-ডু খেলছে। টিফিন ক্যারিয়ারটা পেলে সত্যি খুব কাজ হত। ওতে লুচি, আলুর দম, ডিমসেদ্ধ এইসব ছিল।

ইস—কতদিন যে আমি আলুর দম খাইনি ! আর লুচি যে কী রকম সে তো বলতে গেলেই ভুলেই গেছি। লুচি কী দিয়ে বানায়— সুজি না পোস্ত দিয়ে ? লুচি কি হাতখানেক করে লম্বা হয় ?

আর থাকতে না পেরে আমি ক্যাবলাকে একটা খোঁচা দিলুম।

ক্যাবলা মুখটাকে ঠিক চামচিকের মতো করে বসে ছিল। আমার খোঁচা খেয়ে খ্যাঁচখেঁচিয়ে উঠল।

—ক্যা হুয়া ? জ্বালাচ্ছিস কেন ?

আমি চুপি চুপি বললুম, আঃ চ্যাঁচাসনি। কুট্টিমামা শুনতে পাবে। বলছিলুম, বড্ড খিদে পেয়েছে। সেই যে টিফিন ক্যারিয়ারটা সঙ্গে এসেছিল, সেটা কোথায় বল দিকি ?

ক্যাবলা হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল।

—ছিঃ প্যালা, তোর লজ্জা হওয়া উচিত ! টেনিদার এখনও দেখা নেই—কোথায় হাতির পিঠে চেপে সে চলে গেল, আর তুই এখন খেতে চাইছিস ?

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, না-না-না—এমনিতে জানতে চাইছিলুম।

কী করা যায়— চুপ করে বসে থাকতে হল। সত্যি কথা— লিডার টেনিদার জন্যে আমারও বুকের ভেতর তখন থেকে আঁকুর-পাঁকুর করছে। কিন্তু— খিদেটাও যে আর সইতে পারছি না। টেনিদা বেঁচে আছে কি না জানি না, কিন্তু আমিও যে আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকব, সে-কথা আমার মনে হচ্ছে না।

কী আর করি—চুপ করে বসে আছি। গাড়িটা বনের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে। অন্ধকার দু'ধারে বেশ ঘন হয়ে এসেছে— নানা রকম পাখি ডাকছে। ঝিঁঝিরা ঝিঁ ঝিঁ করছে।

হঠাৎ হাবুল চেঁচিয়ে উঠল, বাঘ—বাঘ—

আবার বাঘ ! এ কী বাঘা কাণ্ডে পড়া গেল রে বাবা ।

কুট্টিমামা বললেন, কোথায় বাঘ ?

আমি ততক্ষণে দেখেছি। বললুম, ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে। মোটরের আলোয় দুটো লাল চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ওখানে।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, বাঘ নয়, ও খরগোশ।

—খরগোশ ! অতবড় চোখ ! অমন জ্বলে ?

—জানোয়ারদের চোখ অমনিই হয়। আলো পড়লে ওইভাবেই জ্বলে। দ্যাখো—দ্যাখো—

গাড়িটা তখন কাছে এসে পড়েছে। দেখি, সত্যিই তো একটা খরগোশ। একেবারে গাড়ির সামনে দিয়ে লাফিয়ে পাশের ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল।

ক্যাবলা বললে, খরগোশের চোখই এই ! বাঘের চোখ হলে—

—আগুনের মতো দপ-দপ করত। শিকারে স্পটিংয়ের সময় চোখ দেখেই জানোয়ার ঠাহর করা যায়।

—স্পটিং কাকে বলে ?

—একটা সার্চলাইটের মতো আলো। স্পটলাইট বলে তাকে। রাত্রে বনের মধ্যে সেইটে ফেলে শিকার খুঁজতে হয়। জানোয়ারের চোখে পড়লে থমকে দাঁড়িয়ে যায়— ধাঁধা লেগে যায় ওদের। তখন গুলি করে মারে।

কথাটা শুনে আমার ভালো লাগল না। এ অন্যায়। মারতে চাও তো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মারো। চোখে আলো ফেলে, ধাঁধিয়ে দিয়ে গুলি করে মারা কাপুরুষের লক্ষণ। আমি পটলডাঙার প্যালারাম— জীবনে আমি হয়তো কখনও শিকারি হতে পারব না, কিন্তু যদি হই, এমন অন্যায় আমি কিছুতে করব না।

ঘ্যাস—স্—

গাড়িটা থেমে গেল। আরে— এ কোথায় এসেছি।

বনের বাইরে কয়েকটা তাঁবু। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। একদিকে তিন-চারটে হাতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলাগাছ খাচ্ছে। আর তাঁবুর সামনে—

একটা টেবিলে জনতিনেক লোক বসে বসে তরিবত করে খাচ্ছে। তাদের একজন—

আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলুম : টেনিদা !!!

টেনিদা গম্ভীর গলায় বললে, কী, এসে গেছিস সব ? এখন বিরক্ত করিসনি, আমি কাটলেট খাচ্ছি।

আর টেবিল থেকে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে কুট্টিমামাকে বললেন, এই যে গজগোবিন্দবাবু, আসুন— আসুন। আপনার ভাগ্নে আমাদের হাতির পিঠে সোয়ার হয়ে এসে উপস্থিত— ভয়ে হাফ ডেড। আমরা অনেকটা চাঙ্গা করে তুলেছি এতক্ষণে। আসুন—আসুন—চা খান—

আমরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লুম। আর তাই দেখে টেনিদা গোগ্রাসে কাটলেটটা মুখে পুরে দিলে।

সেই ভদ্রলোক বললেন, এসো—এসো। তোমরা আসবে আন্দাজ করেছিলুম, তোমাদের জন্যেও কাটলেট ভাজা হচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝেছ তো এতক্ষণে ? না, না— ওরা বুনো হাতি নয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পোষা হাতি। মাসখানেক হল ওঁরা কী কাজে এখানে ক্যাম্প করেছেন। ওঁদেরই হাতি চরতে

চরতে এদিকে এসেছিল, আর টেনিদা তারই একটার পিঠে চড়াও হয়ে—

কী কাণ্ড ! কী কাণ্ড !

কাটলেট ভাজা হচ্ছে হোক— কিন্তু আমার যে প্রাণ যায় ! ক্যাবলাকে বললুম, ক্যাবলা, সেই টিফিন ক্যারিয়ারটা—

ক্যাবলা বললে, দি আইডিয়া ! তারপর এক হ্যাঁচকা টানে কোত্থেকে সেটাকে টেনে নামাল ।

তারপর ?

তারও পর ? উহুঁ, আর নয় । অনেকখানি গল্প আমি তোমাদের শুনিয়েছি, এর পরেরটুকু যদি নিজেরা ভেবে নিতে না পারো, তাহলে মিথ্যেই তোমরা চারমূর্তির অভিযান পড়েছ ।